ভৌতিক কাহিনি

দেখা হবে কবরে

শেখ আবদুল হাকিম



দেখা হবে কবরে

শেখ আবদুল হাকিম

প্রথমা প্রকাশনী

‘কেন, কান্তিক’, গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলল নন্দন, ‘তোর তো জানার কথা, ভলতেয়ার বলেছেনঃ-

“God is a comedian, playing to an audience too afraid to laugh.”

আমাদের এই বন্ধুটি, নন্দন বসাক, বেশ জ্ঞানী-গুণী মানুষ;কলেজে দর্শন পড়ায় এবং ভলতেয়ারের সাংঘাতিক ভক্ত।

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ এক ক্যাম্পাসে দেখা হয়ে যাওয়ায় জোর করে ধরে নিয়ে গেল ।

ওর নতুন ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে বসে চা-চানাচুর খাচ্ছি; রায় দিচ্ছি, ফেসবুক ঝামেলার আকর; তারপর উদ্ধার করছি দেশ-দশ-দুনিয়া। হালকা কৌতুক এবং গুরুগম্ভীর আলোচনার ফাঁকে হঠাৎ আঁতকে উঠল নন্দন। ‘আরে, রাখ তোর ঈশ্বর আর তার পোষ্য প্রজাকুল, আসল কথাটাই তো তোকে বলা হয়নি! এই ঢাকা শহরে আমি একটা হানাবাড়ি আবিষ্কার করেছি।’

“সত্যিকার? কারা হানা দিয়েছে? ভূতেরা বুঝি?”

“শোন দোস্ত, তোর এত সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়- আমি শুধু এটকু জানি ; দেড় মাস আগে তোর বউদিকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম কলেজেরকাছাকাছি কোথাও “টু লেট” ঝুলছে কি না দেখার জন্য।

আসবাবপত্রসহ ফ্ল্যাট পাওয়া সহজ কথা নয়,কিন্তু আমাদের ও-রকমই পেতে হবে। পর পর তিনদিন চেষ্টা করেও পাই না, পাই না; কাজেই সেদিন

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেছি। পুরান ঢাকার আধা সরু এক বিখ্যাত গলিতে, যেখানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাড়িঘর দাঁড়িয়ে আছে, সারাক্ষণ হাঁটাচলা করছে প্রচুর লোকজন, দেখলাম বেশ পুরোনো একটা বাড়ির গেটে জংধরা টিনের পাত ঝুলছে, তাতে লেখা-আসবাবসহ এই বাড়ি ভাড়া হইবে। বিশ্বাস কর, হাতে বৈশাখী চাঁদ পাওয়ার মতো খুশি হলাম।তবে তখনই আমার অগ্রিম একটা প্রণাম ঠকে দেওয়া উচিত ছিল ভলতেয়ারকে।"

'সেটা কেন?'

"আরে, বোকা," "Everything's fine today, that

is our illusion-এই কথা তিনি ছাড়া আর কে বলবেন, বল?"

"হাতে বৈশাখী চাঁদ পাওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?"

"সম্পর্ক চাঁদ পাওয়ার সঙ্গে নয়, আমার খুশি হওয়ার সঙ্গে, গর্দভ কোথাকার! আর ওই গানটা শুনিসনি আজি বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে, চল পলায়ে যাই...?"

'অ। না। তা কী যেন বললি, বিখ্যাত গলি? মনে করিয়ে দিলাম।'

'বিখ্যাত এই জন্য যে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ওই গলিতে বাস করতেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমার মতো তিনিও টিপু সুলতান রোডে গ্র্যাজুয়েট

স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর ডাকনাম মায়া। তাঁর সঙ্গে আমার বাবাও একই সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন।'

'ও, আচ্ছা। বল, তারপর কী হলো।'

"ওটা দোতলা বাড়ি। ভেতরে ঢুকলাম আমরা, ঘরদোর পছন্দ হলো। পরের সপ্তায় কথাবার্তা পাকা করে উঠলামও, কিন্তু তৃতীয় দিনে ওই বাড়ি ছেড়ে

পালিয়ে আসতে হয়েছে। দুনিয়ার কোনো শক্তি তোর বউদিকে আরেকটা দিন ওখানে রাখতে পারত না এবং সেজন্য ওকে আমি এতটুকু দোষ দিই না। স্নায়বিক রোগে কাহিল হয়ে পড়ায় ওকে আমি ওর মায়ের কাছে,

গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

'কেন, কী দেখেছিস?'

"মাফ কর, কান্তিক, তুই আমাকে ভীতু বা কুসংস্কারের শিকার বললে সেটা আমার সহ্য হবে না,আমি অপমানিত বোধ করব। নিজের বোধবুদ্ধি আর অনুভূতিতে ধরা না পড়লে তুই-ই বা কোনো কিছুকে অবিশ্বাস্য বলবি কেন? সে রকম কিছু দেখিনি বা শুনিনি। উল্টোটা বললে তুই নানা ব্যাখ্যা দিয়ে

আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করাতি ওগুলো আমাদের চোখ আর মনের ভুল ছিল । শুধু এটুকু বলি, ওই বাড়ির বিশেষ একটা কামরার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে, যেখানে কোনো আসবাবপত্র নেই, অবর্ণনীয় আতঙ্ক

আমাদের দুজনকে গ্রাস করছিল; অথচ সত্য আমরা ওখানে কিছু দেখিনি বা শুনিনি। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানিস? জীবনে এই প্রথম তোর বউদির সঙ্গে আমি কোনো বিষয়ে একমত হতে পেরেছি-ওর খুলিতে হলুদ পদার্থের যতই ঘাটতি থাকুক। তৃতীয় রাতের পর, ওর কথায় সায় দিয়ে আমিও বললাম, ওই বাড়িতে আর একটা রাত কাটানো অসম্ভব।"

'কাজেই চার দিনের দিন সকালে বাড়ির কেয়ারটেকারকে ডেকে পাঠালাম। লাঠির ওপর ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটেন তিনি, তার ওপর মহিলা, তার ওপর চোখে ছানি পড়ায় কম দেখেন। বললাম, অনেক কিছুই আমাদের পছন্দ হচ্ছে না, তাই বাড়িটা আমরা ছেড়ে দেব । শুনে তিনি কী বললেন জানিস? বললেন "মুই জানি, আপনেরা পলাইতেছেন । তয় বাকি হকলের চাইতে বেশি দিন থাকতে পারলেন। দুই রাইত এহানে খুব কম ভাড়াইট্টা কাটাইছে। আপনারাই পেরথম তিন রাত টিইক্কা গেলেন। আমার যেমন লাগে আপনেদের ওপর তিনারা খুব সদয়।'

"তিনারা...মানে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

বৃদ্ধা মাথা দোলাতে দোলাতে উত্তর দিলেন, "ক্যান, বাড়িটা যিনারা দখল কইরা রাখছেন। তিনাদের পরিচয় জিগাইলে কিছু কইতাম পারতাম না। তয় মুই তিনাগোরে কিছু মনে করি না। বহুতকাল আগের কতা,তিনাদের কতা আমার মনে আছে, তহন এই বাড়িতে আমি আছিলাম-তয় দাসী হিসেবে না।

আইজকাল তিনারা আমারে তেমুন একটা দেহা না দিলেও, মুই জানি, একদিন তিনাগা হাতেই আমার মরণ লিখা আছে। গেরায্যি করি না-বুড়া অইছি, মরণের ডাক পামু, হেরপর তিনাদের লগে এই বাড়িতে মুইও থাহুম।"

"কান্তিক রে, তোকে আমি বলে বোঝাতে পারব না মহিলা এত শান্ত, তাঁর ভঙ্গি এত স্বাভাবিক! এটা আরও ভয় পাইয়ে দিল, বুঝলি। চাবির গোছাটা ধরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।"

'তুই দেখছি আমার কৌতূহল জাগিয়ে দিলি,' নন্দনকে বললাম। 'একটা হানাবাড়িতে রাত কাটানোর চেয়ে রোমাঞ্চকর কিছু আছে? ঠিকানাটা দে।'

চাওয়ামাত্র ঠিকানা দিল নন্দন, তবে দেওয়ার পর বলল, 'জানি, আমি নিষেধ করলেও তুই শুনবি না, ওখানে তুই যাবিই। কথাটা তিনি কি আর শুধু শুধু বলে গেছেন-"Common sense is not so common."

নন্দন বা ভলতেয়ার, কাউকে গ্রাহ্য না করে তখনই রওনা হয়ে গেলাম আমি। এবং তারপর কী আজব একটা অভিজ্ঞতা হলো, সবটুকু খুলে না বললে কাউকে বোঝানো যাবে না। আর বিশ্বাস? তোমরা কেউ বিশ্বাস

করবে না জেনেই এই লেখা লেখতে বসা হয়েছে। শুধু এলাকাটা না, ওই রাস্তাও তোমরা অনেকে চেনো বা নাম শুনেছ। নারিন্দায়, টিপু সুলতান রোডের পাশে, ডাকনাম ভূতের গলি, ভালা নাম ভজহরি সাহা স্ট্রিট।

বাড়িটা অমি বন্ধ ও খালি পেলাম। গেটে বা পাঁচিলে জংধরা টিনের পাতও চোখে পড়ল না।কলবেলের বোতাম টিপলাম, কারও সাড়া নেই

পাশের সরু গলিতে আর্বজনা ঘাটছিল এক কিশোর, এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “কারে খুঁজন, সাব?”

“শুনলাম এই বাড়িটা নাকি ভাড়া হবে, তাই...”

‘ক্যা, আপনের কি ভূতের লগে থাহনের শখ চাপছে? হিহিহিঃ দিব নে ঘাড় মটকায়া...’

‘এই বেয়াদব, কী বলো? এভাবে হাসছ কেন?’

‘এই বাড়ি ভাড়া অইব? কেমবে? আইজ তিন হাপ্তা অইল যে বুড়ি এই বাড়ি দেখশোনা করত হেই-ই তো মইরা ভূত অয়া গেছে। জব্বর সাবে কত্তো লোভ দেহান, মাগর...জে-না, এই বাড়িতে থাহনের লোক

পাওন যাইতাছে না। আমার মায়েরে মাসে বারোশ ট্যাহা দিতে চাইছেন; কাম-পেততেক দিন জানালা-দরজা খুইলা আবর বন্ধ করতে লাগব। মায় রাজি অয় নাই।’

‘কেন?’

‘কইলাম না এইডা ভূতের বাড়ি! বুড়িডারে বিছনায় মরা পাওয়া গেছে, চোখ দুইডা এক্কেরে পুরা খুলা মাইনষে কইতাছে শয়তানে হেরে গলা টিইপা মারছে।পুলিশও কইছে-গলায় আঙুলের দাগ।’

‘ঠিক আছে, থামো এবার। জব্বার সাহেবের কথা বললে, তিনিই কি এই বাড়ির মালিক?’

‘হ।’

‘তুমি জানো কোথায় থাকেন তিনি?’

“এই তো রাস্তার হেই পারে, র‍্যাংকিন ইসটিটে বাড়ির লগে গোলাপবাগান পাইবেন।”

‘কী করেন তিনি? ব্যবসা?’

‘জব্বর সাবেরে কিছু করতে লাগে না। মাগর হের কেউ নাইক্যা।’

তথ্যগুলো পেয়ে আমি খুশি, আধলা ছেলেটার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে জব্বার চৌধুরীর খোঁজে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের দিকে হাঁটা ধরলাম। সামনে গোলাপবাগান নিয়ে বাড়ি, পুরান ঢাকায় এর চেয়ে স্পষ্ট ঠিকানা আর

কী হতে পারে!

যেমনটি আশা করেছিলাম, নেমপ্লেটে দেখলাম লেখা রয়েছে। জব্বার চৌধুরী, জব্বর নয়। ভাগ্য ভালো, বাড়িতেই পেলাম তাঁকে। বয়স এখনো পঞ্চাশ

পেরোয়নি, চোখের দৃষ্টিতে প্রখর বুদ্ধির ঝিলিক,কভাবভঙ্গি রীতিমতো কেতাদুরস্ত।

নিজের পরিচয় দিলাম, খুলে জানালাম কেন এসেছি। বললাম, ‘সবাই বলছে ভজহরি স্ট্রিটে আপনার ওই বাড়িটায় ভূত-টুত কিছু একটা আছে। আপনার অনুমতি পেলে কথাটা সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখত চাই আমি। সেটা সম্ভব হবে আপনি যদি এক রাতের জন্য বাড়িটা ভাড়া দিতে রাজি হন। আমাকে। যা ভাড়া চান দেব আমি...’

“আপনাকে এক টাকাও দিতে হবে না, ডাক্তার কান্তিক,” অমায়িক জব্বার চৌধুরী মৃদুকণ্ঠ বললেন। “এক দিন কেন, যত দিন ইচ্ছে থাকুন আপনি। আমিও জানতে চাইছি কী আছে ওখানে। অত বড় একটা বাড়ি, মতিঝিলের একেবোরে গা ঘেঁষে, অথচ না কেউ ভাড়া থাকবে, না কেউ ন্যায্য দামে কিনবে। ঘরদোর ঝাড় দেওয়ার লোক পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।লোকজন যখন পালাচ্ছে, তার একটা কারণ তো অবশ্যই আছে, তাই না?”

এটা কোনো কথা হলো, স্টিফেন হকিং যেখানে স্ট্রিং থিওরি দিচ্ছেন, বহুবিশ্বের কথা বলছেন, সেই যুগে ভূতের ভয়ে আমরা থরথর করে কাঁপব? তাও শুধু রাতে নয়, বলা হচ্ছে দিনদুপরেও উপদ্রব চলে, তবে রাতে তার মাত্রা নাকি রীতিমতো ভয়াবহ । অবশ্যই এর একটা বিহিত হওয়া দরকার । আপনি তদন্ত চালান, আমি আপনাকে সব রকম সহায়তা দেব।’

“শুনলাম কেয়ারটেকার মহিলা...”

'হ্যাঁ, ওখানেই তিন সপ্তাহ আগে মারা গেছেন। বেচারি বিড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করতেন, সেখান থেকে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখে রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলাম । কারণ, ওই বৃদ্ধাকে ছোটবেলায় আমাদের পরিবারের কেউ কেউ চিনত বলে শুনেছি। একসময় তাঁর আর্থিক অবস্থা এত ভালো ছিল যে আমার কাকার কাছ থেকে ওই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে বাস করতেন তিনি। কিছুটা লেখাপড়া জানা মহিলা, সাহসী, ভালো বংশ, কিন্তু... ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকালেন, ...ভাগ্যে খারাবি থাকলে যা হয় আর কি। যা-ই হোক, আমার জানামতে একমাত্র তিনিই আমার ওই বাড়িতে টিকতে পারতেন।

খুব বয়স হলেও, তেমন রোগশোক ছিল না, তাই তাঁর মৃত্যুটা আমারও অকস্মাৎ বলে মনে হয়েছে। ময়নাতদন্তও একে স্বাভাবিক মৃত্যু বলা হয়নি, গলায় দাগ পাওয়া গেছে। পাড়ায় ব্যাপারটা নিয়ে নানা গুজব ছড়াচ্ছে। এখন সমস্যা হলো, ওখানে থাকার মতো আমি কোনো লোক খুঁজে পাচ্ছি না। এমনকি দেখে রাখারও কেউ নেই। আপনি যদি এক বছরও বিনা।ভাড়ায় থাকতে চান, আমি রাজি । শুধু গ্যাস, পানি আর

বিদ্যুতের বিল দিলেই হবে।'

জানতে চাইলাম, 'তা কবে থেক বাড়িটার এই অবস্থা? মানে, কত দিন হলো মানুষ হানাবাড়ি বলছে?'

'সেটা আমার জানা নেই, তবে এই পরিস্থিতি বহু বছর ধরেই চলছে। যে বৃদ্ধার কথা বললাম, তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর

আগে কাকে যেন ভাড়া দেওয়ার পর থেকে ব্যাপারটা শুরু হয়। আমি আমার কৈশোর থেকে কানাডার কুইবেকে থাকি, তা থাকলেও দু-চার বছর পর পর একবার করে দেশে আসা হয়। গত বছর বাংলাদেশে এসে একমাত্র উত্তরাধিকার হওয়ার সূত্রে এক কাকার সমস্ত সয়সম্পত্তি পেয়েছি, তার মধ্যে এই বাড়িটাও আছে।বন্ধ পেয়ছিলাম, কেউ নাকি ওখানে বসবাস করতে রাজি হয় না। কারও কথায় কান না দিয়ে ভাঙা ছাদ মেরামত করেছি, গোটা বাড়ি রং করেছি,পুরোনো গুলোর সঙ্গে কিছু আধুনিক আসবাবপত্র যোগ করেছি, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। এক বছরের চুক্তিতে একজন ভাড়াটেও পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক একজন কর্নেল, অবসর নিয়েছেন। এক ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে উঠলেন, সঙ্গ তিন-চারজন চাকর।পরদিনই বাড়িটা ছেড়ে চলে গেলেন ওরা। পাড়ার লোকজনকে বলে গেলেন, অদৃশ্য কারা যেন বাড়িটা দখল করে রেখেছে, তাদের ভয়ে পালাতে হচ্ছে তাঁদের। এরপর আমি ওই বৃদ্ধাকে ডেকে আনি; তিনি ঘরদোর পরিষ্কার, ভাড়াটে জোগাড় ইত্যাদি সব কাজ করবেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এমন একজন ভাড়াটেও পাইনি যে তিন দিনের বেশি ওই বাড়িতে থাকতে পেরেছে।’

‘কী কারণ, ব্যাখ্যা করেনি তারা?’ জানতে চাইলাম আমি।

‘তাদের কার কী গল্প, তা শুনে আপনার কাজ নেই, শুধু বলি তাদের একজনের গল্প আরেকজনের সঙ্গে হবহু মেলে না। অতীতের দ্বারা প্রভাবিত কল্পনা নিয়ে ওখানে ঢোকার চেয়ে ভালো হয় আপনি যদি নিজে

বিচার করেন। শুধু এ রকম একটা ধারণা নিয়ে যান যে অনেক কিছুই শুনতে পাবেন বা দেখতে পাবেন, আবার হয়তো কিছুই দেখতে বা শুনতে পাবেন না। তবে যেভাবেই চান, সাবধানতা অবলম্বন করতে ভুলবেন না, এটাই আপনার প্রতি আমার অনুরোধ।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করি। আপনার কখনো ইচ্ছে বা কৌতূহল হয়নি যে একটা রাত ওই বাড়িতে কাটাই?'

'হয়েছে। এক রাত নয়, ওই বাড়িতে দিনদুপুরে আমি একা তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি। আমার কৌতূহল মেটেনি, তবে তা মিইয়ে গেছে। না, ওই অভিজ্ঞতা নবায়ন করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। অভিযোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আমি নিজেই স্বীকার করছি-পুরোপুরি মন খুলে কথা বলছি না। আরেকটা কথা, আপনার আগ্রহর মাত্রা যদি ব্যগ্রতার

পর্যায়ে পৌছে থাকে, আর যদি আপনার স্নায়ু অস্বাভাবিক শক্ত হয়, তবেই আপনাকে আমি ওই বাড়িতে এক রাত থাকার পরামর্শ দেব। তা না হলে

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।'

'বিশ্বাস করুন, আগ্রহ আমার মগজ কুরে কুরে খাচ্ছে, জানালাম তাঁকে। যদিও অচেনা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে নিজের স্নায়ু নিয়ে গর্ব করা মোটেও সুস্থতার

লক্ষণ নয়, তবু না বলে পারছি না যে আমার স্নায়ু এত বিভিন্ন ধরনের বিপদের মধ্যে দিয়ে গেছে, ওগুলোর ওপর আমি চোখ বুজে নির্ভর করতে পারি—এমনকি একটা ভূতুড়ে বাড়িতেও ।'

এরপর আর প্রায় কোনো কথাই বললেন না জব্বার চৌধুরী, দরাজ খুলে চাবির গোছা বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে ওখান থেকে চলে এলাম, মুঠোর ভেতর চাবির গোছাটা সদ্য জেতা পুরস্কার বলে মনে হচ্ছিল।

২

পরীক্ষা শুরু করার জন্যে অধীর; বাড়ি ফিরেই গ্রাম থেকে আসা আমার অতি বিশ্বস্ত জ্ঞাতিভাই তন্ময়কে ডাকলাম ।তন্ময় আমাকে সমীহ করে,

না চাইলেও আমার সেবা করার জন্য এক পায়ে খাড়া থাকে। একসময় আমরা দুজন দেশে ও বিদেশে অনেক কীর্তি [কু ও সু, দুটোই] করে বেড়িয়েছি। ঢাকায় এসে আমার বাড়িতে উঠেছে তন্ময়, কী সব ঝামেলা কেটে গেলেই প্লেন ধরে কাতার না কুয়েতে চাকরি করতে চলে যাবে।

ওর মতো সতেজপ্রাণ তরুন খুব কমই দেখেছি আমি, আর ওর দুঃসাহসেরও কোনো তুলনা হয় না। এখনো আমি গ্রামে বেড়াতে গেলে দুজন মিলে প্রায়ই 'তেনাদের' খোঁজে শ্মশান আর গোরস্তান চষে বেড়াই।

বলাই বাহুল্য যে আজ পর্যন্ত সফলকাম হইনি। 'তন্ময়', বললাম ওকে,

তোর মনে আছে,গৌহাটির কাছে কামাখ্যা পর্বতে, যেখানে সীতাদেবীর অঙ্গ পড়েছিল বলে বলা হয়, ওটার কাছাকাছি প্রাচীন একটা কালীমন্দিরে আমরা রাত কাটিয়ে ছিলাম? সবার ধারণা, ওখানে মুন্ডুবিহীন একটা আত্মা বাস করে।কিন্তু সেই আত্মা বা ভূতকে দেখতে পাসনি বলে তোর সে কি আফসোস!'

'হে হে, ভাইজান, খুব মনে পড়ে।'

‘গৌহাটির ওই ভূতকে ঢাকায় পাওয়া গেলে কেমন হয় বল দেখি?’

‘চলেন যাই, এখনই দেখে আসি।’ তন্ময় একপায়ে খাড়া।’

‘না, ঠাট্টা নয়, শোন। আমি আজ ঢাকার একটা হানাবাড়ির কথা শুনে এলাম, যতটুকু বুঝতে পারছি ওখানে কিছু একটা না থেকে পারে না। ভয় পাচ্ছি, খুব মারাত্মক কিছুও হতে পারে সেটা। ভাবছি, আমার কি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে? মানে, মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া তুই কি যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবি?’

‘ভাইজান, কী যে বলেন!’ বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল তন্ময়।

‘করার মতো কিছু না পেয়ে শুধু কাঁদতে বাকি আছে আমার। সত্যি আমি এখনই রওনা দিতে চাই। ভূত আমার পুত...’

‘ঠিক আছে’, তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিলাম ওকে। ‘তাহলে বেরিয়ে পড়। এই রাখ চাবি, আর এই নে বাড়ির ঠিকানা। আমার জন্য একটা বেডরুম বাছাই করবি, তোর যেটা ভালো লাগে। বেশ কিছুদিন খালি পড়ে আছে, যতটা পারিস পরিষ্কার করবি বাড়িটা। আমার পিস্তল ...থাক, ওটা আমিই নিয়ে যাব, তুই শুধু আমার সুইস নাইফটা সঙ্গে নে। তোর নিজের জন্যও যা ভালো মনে করিস নিবি।’

‘আমার পছন্দ হকিস্টিক, কম বয়সে হরতালের দিন যেটা দিয়ে আপনি গাড়ি ভাঙচুর করতেন’।

লজ্জা পেলাম। বললাম, ‘ঠিক আছে, এবার তুই যা’।

দিনের বাকি সময় জরুরি এমন সব কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো আমাকে যে আসন্ন রাতের রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে চিন্তা করার সময় পেলাম না। করলা,পটোল, বেগুন আর ঢ্যাঁড়শ ভাজি দিয়ে রাতের খাবার একাই খেলাম, খেতে বসে অভ্যাসমতো বই পড়ছি।

ট্রটস্কি মেক্সিকোতে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন,তারপরও তাঁকে কীভাবে খুন হতে হলো তারই রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা,থ্রিলারের মতো করে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। ভাবলাম হানাবাড়িতে নিয়ে যাই বইটা, মন থেকে কুসংস্কার তাড়াতে সাহায্যে আসতে পারে।

সাড়ে নয়টার দিকে কোটের পকেটে বইটা নিয়ে রাস্তায় নামলাম, হানাবাড়িতে যাচ্ছি, হাতে সরু শিকল। শিকলের অপর প্রান্ত আমার প্রিয় কুকুর কুজোর গলায় পেঁচানো কলারের সঙ্গে সংযুক্ত। স্টিফেন কিংয়ের লেখা কুজোর প্রকান্ডদেহী সেইন্ট বারনারড নয়, এটা ধারালো বুদ্ধির অধিকারী, দৃঢ়চেতা,সতর্ক প্রহরায় অভ্যস্ত একটা বুল-টেরিয়ার-এর স্বভাবই হলো রাতের অন্ধকারে ভুতুড়ে গলি-ঘুপচিতে ইদুর খুঁজে বেড়ানো। ভূতকে যদি থাকে সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য এর চেয়ে ভালা কুকুর আর হয় না। শীত আর বেশি দিন থাকবে না, তবে এখনো বেশ ঠান্ডা পড়ছে, আকাশ প্রতিদিনই নিষ্প্রভ রুপো। তবে আজ চাঁদ আছে, হোক সেটা ম্লান আর

দেখত সরু কাস্তে । হিমালয় ছুঁয়ে আসা মেঘ যদি অনুমতি দেয়,মাঝরাতের দিকে ঢাকার আকাশে ওটাকে আরও একটু উজ্জ্বল দেখতে পাব আমরা।

হানাবাড়িতে পৌছালাম, নক করলাম, মুখভর্তি হাসি নিয়ে দরজা খুলে দিল তন্ময়।

'কী রে, খবর কী?'

''সব ঠিক আছে, ভাইজান। কোথাও কোনো সমস্যা নেই''

'তাই?' আমি একটু হতাশ হলাম। বলার মতো কিছু দেখিসনি? বা শুনিসওনি?

'না, ভাইজান। কিছু শুনিনি বলাটা ভুল হবে,শুনেছি।'

'কী? কী?'

''প্রথমে পায়ের শব্দ, আমার পেছনে থপ থপ করছিল। তারপর এক কি দুবার অস্পষ্ট আওয়াজ, যেন।আমার কানের পাশে ফিসফিস করছিল। এই-ই, আর কিছু না।'

'তুই ভয় পাসনি?'

তন্ময় ঠোঁট বাকিয় হাসল। 'ভাইজান, আপনার চেয়ে ভালো কে জানে, আমি ভয় পাবার বান্দা?'

সাহসে ভরপুর তন্ময়ের দৃষ্ট দেখে আশ্বস্ত বোধ করলাম, যা-ই ঘটুক না কেন, ও আমাকে ছেড়ে পালাবে না। আমরা হলঘরে রয়েছি, বারান্দা আর রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ। আমার নজর এখন কুজোর ওপর, প্রথমে প্রবল আগ্রহ নিয়ে ছুটোছুটি করেছে, কিন্তু এখন দেখছি দরজার কাছে গিয়ে কবাট আঁচড়াচ্ছে, বাইরে বেরোনোর জন্য নাকি সুরে কাঁদছে। মাথায় হাত

বুলিয়ে একটু আদর করলাম, নরম সুরে উৎসাহ জোগালাম, মনে হলো তাতেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সে। তার পর থেকে আমার আর তন্ময়ের পিছু পিছু বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেকোনো নতুন পরিবেশে কুজোর স্বাভাবিক আচরণ হলো অনুসন্ধিৎসু ভাব নিয়ে সবার আগে থাকা, কিন্তু এখানে সেটা দেখা যাচ্ছে না, তার বদলে সব সময় আমার গোড়ালির আশপাশে থাকছে।

এটা বহু যুগ আগে তৈরি বেশ বড় একটা বাড়ি, যদিও সময়ে সময়ে ভেঙেচুরে আধুনিকতার ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।একতলা থেকে নিচে নামার কয়েকটা কাঠের ধাপ দেখা গেল, নিচের ওই পাতালে কয়েকটা ঘরও আছে । বাড়ির রান্নাঘর ওখানে, পাশেই ভাঁড়ার ঘর; উল্টো দিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন লাইব্রেরি, বহু বছর সেখানে কারও পা পড়নি-ধুলো, মাকড়সার বাড়ির রান্নাঘর ওখানে, পাশেই ভাঁড়ার ঘর; উল্টো দিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন লাইব্রেরি, বহু বছর সেখানে কারও পা পড়নি-ধুলো, মাকড়সার জাল, ইদুর, তেলাপোকা আর মশার রাজ্য। একটা কামরার ভেতর ভাঙা কাঠের আলমারি রয়েছে, তাতে কয়েকটা তেল চিটচিটে বোতল, ভেতরে তরলপদার্থ,

লেবেলের লেখা এত ঝাপসা যে পড়া সম্ভব নয়। একটা বোতলের ছিপি খুলে নাকের সামনে ধরলাম। অ্যালকোহল!

"একটা জিনিস অন্তত বোঝা গেল, এখানকার ভূত বাবাজিরা মাদকাসক্ত নয়", মন্তব্য করল তন্ময়।

বাড়ির বাকি অংশের কোথাও চোখে লাগার মতো বা আগ্রহ জাগানোর মতো কিছু দেখলাম না। পেছনদিকে একটা উঠান আছে, চারপাশের বাড়িতে আলো জ্বললেও, সেটা প্রায় অন্ধকার। এর জন্য দায়ী বাড়ির অস্বাভাবিক উচু পাঁচিল । চত্বরটা পাকা, ছোট ছোট চৌকো পাথর বসিয়ে তৈরি। পাথরের মেঝে কী কারণে জানি না স্যাঁতসেঁতে। প্রচুর ধূলো জমেছে ওখানে, তাও ভেজা ভেজা। হাঁটার সময় আমাদের পায়ের ছাপ রয়ে গেল পেছনে। আর এখানেই এই আশ্চর্য বাসস্থানের প্রথম রহস্যময় ঘটনাটা চাক্ষুষ করলাম। ঠিক আমার সামনে, পরিষ্কার দেখলাম, পায়ের একটা ছাপ হঠাৎ করে নিজে থেকে ফুটে উঠল।দাঁড়িয়ে পড়েছি, তন্ময়কে খপ করে ধরে ফেলেছি;

তারপর আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তন্ময়ও দেখতে পেল। এবার দুজনে একসঙ্গে দেখলাম আমরা।

পায়ের ওই ছাপের সামনে অকস্মাৎ আরেকটা পায়ের ছাপ তৈরি হলো।

দ্রত পা বাড়ালাম আমি, আমার পাশে তন্ময়, আমাদের সামনে পায়ের নতুন নতুন ছাপও একের পর এক দ্রুত তৈরি হতে লাগল। ছাপগুলো

ঝাপসা,অস্পষ্ট, যে কারণে আকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যাচ্ছে না। তবে ওগুলো ছোট,. যেন কোনা শিশুর পা, সেই পায়ে স্যান্ডেল বা জুতো-টুতো কিছু নেই। অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা থামল আমরা উল্টোদিকের দেয়ালে কাছে চলে আসায়, ওগুলো আর ফিরল না।ধাপ বেয়ে উঠান থেকে একতলায় উঠে এলাম আমরা।এক এক করে প্রতিটি কামরায় ঢুকছি।

সাজানো-গোছানো বড় বৈঠকখানা, খাবার ঘর। পেছনদিকে ছোট আরেকটা বসার ঘর। আরেক পাশে অতিরিক্ত একটা কামরা, সম্ভবত চাকরবাকর কারও থাকার জন্য। সব স্থির, প্রাণহীন।

বৈঠকখানায় ফিরে এসে একটা আরামকেদারায় বসলাম। লোডশেডিং শুরু হয়েছে, টেবিলের ওপর মোম জ্বালল তন্ময়। আমি ওকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বললাম। ঘুরে এগাচ্ছে ও, আমার উল্টোদিকের একটা চেয়ার দেয়ালের কাছ থেকে নিঃশব্দে এবং দ্রুত সরে এসে কাত হয়ে পড়ে গেল আমার পায়ের কাছ থেকে দুই হাত সামনে। কার্পেটের ওপর পড়ায় তেমন কোনো শব্দ হলো না।

'খারাপ লক্ষণ, তবে টেবিল উল্টে পড়ার চেয়ে ভালো', জোর করে হাসতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করলাম। আমার বেসুরো হাসি শুনে শরীরের ভেতর

মাথাটা একটু টেনে নিল কুজো, তারপর ডাকতে শুরু করল কেঁউ কেউ করে-কাউকে হুমকি দিয়ে নয়,– যেন সাহায্য পাওয়ার আশায় কাঁদছে।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এল তন্ময়, চেয়ারটার হাঁটা বা পতন সম্পর্কে কিছুই জানে না। কুজোকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠিল ও। আমি চেয়ারটার দিকেএকদৃষ্টে তাকিয়ে আছি । যেন মনে হলো হালকা নীল

ধোঁয়াটে কিছু অস্পষ্ট রেখা দেখতে পাচ্ছি, যেন মানুষের একটা আকৃতি, কিন্তু রেখাগুলো এতই ঝাপসা যে সন্দেহ হচ্ছে আমি দৃষ্টিভ্রমের শিকার কি না।

কুজো ইতিমধ্যে চুপ করে গেছে।

'চেয়ারটা তোল তো রে', তন্ময়কে বললাম আমি।'দেয়াল ঘেষে রেখে আয়।'

আমার নির্দেশমতো চেয়ারটা তুলে দেয়ালের কাছে রাখল তন্ময়,

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'ভাইজান, আপনি?'

"আমি...কী?"

"কী যেন একটা খোঁচা মারল আমাকে। এই কাঁধে লাগল, খুব জোরে...এই এখানটায়।"

"না, আমি না," বললাম। 'তবে এখানে ধোঁকাবাজ বা জাদুকরদের উপস্থিতি আছে বলে মনে হচ্ছে। ওদের চালাকি এখনো আমরা বুঝতে না পারলেও, ওদেরকে ঠিকই আমরা ধরে ফেলব। ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেবে, সেটি হচ্ছে না।'

জায়গাটা খুব ঠান্ডা আর স্যাতসেঁতে বলে বৈঠকখানায় বেশিক্ষণ আমরা থাকলাম না। সাবধানের মার নেই ভেবে বাইরে থেকে ওটার দরজায়ও তালা লাগিয়ে দিলাম-এর আগে পাতালের যেসব কামরায় গেছি, তার প্রতিটিতে যেমন লাগিয়েছি।

লোডশেডিং চলছেই, সঙ্গে মোমবাতি রাখছি আমরা।

দোতলার সেরা কামরাটাই আমার শোয়ার জন্য বাছাই করেছে তন্ময়। আকারে বেশ বড়, দুটো জানালা দিয়েই বাইরের রাস্তা দেখা যায়। পুরোনো আমলের সেগুন কাঠের বিরাট খাট, কালচে হয়ে গেছে পালিশ। খাটের উল্টোদিকের দেয়ালে একটা খুদে খেলনাঘর,কাচ দিয় ঘেরা শোকেসের মতো, ভেতরে পুতুলসহ প্রচুর খেলনা সাজানো।

বাঁ দিকের দেয়ালে একটা দরজা রয়েছে, বিছানা আর জানালার মাঝখানে। ওটা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়, যেটায় তন্ময় শোবে।

এই দ্বিতীয় কামরাটা ছোট,এখানে খাটের বদলে ডিভান দেখতে পাচ্ছি, আমার বেডেরুমে যাওয়ার দরজা ছাড়া এটা থেকে বেরোনোর আর কোনো পথ নেই।

আমার ঘরে ফিরে এলাম।

জানালার বাইরে একবার চোখ বুলিয়ে তন্ময় রিপোর্ট করল, ‘ভাইজান, লোডশেডিং নেই, শুধু আমাদের আলো জ্বলছে না।

জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম আশপাশের বাড়িতে সত্যি বিদ্যুৎ ফিরে এসেছে। ওর দিকে ফিরে বললাম, ‘এটাই স্বাভাবিক, ওরা যতভাবে পারা যায় ভয় দেখিয়ে আমাদের ভাগাতে চেষ্টা করবে।’

খেলনাঘরের দুই পাশে দুটো দেয়াল আলমারি রয়েছে, একটাও তালা দেওয়া নয়, ম্লান চকলেট রঙের কাগজ দিয়ে ঢাকা। আমরা ওগুলো খুলে পরীক্ষা করলাম। ভেতরে প্রচুর হুক আর হ্যাঙার, সবগুলো থেকে মেয়েদের পরিচ্ছদ ঝুলছে, অন্য আর কিছু নেই। আলমারির পেছনে ইটের দেয়াল, সেটাও ঘুষি মেরে পরীক্ষা করলাম, আওয়াজ শুনে মনে হলো বাড়ির বাকি দেয়ালের মতোই নিরেট।

খুঁটিনাটি আরও কিছু জিনিস পরীক্ষা শেষ করে একটু বিশ্রাম নিতে বসেছি, বাড়ির বাকি অংশ এখনা দেখা হয়নি। রাত জাগতে হবে, তাই ফ্ল্যাস্ক ভর্তি করে কফি এনেছে তন্ময়। এক কাপ শেষ করে একটা চুরুট ধরালাম।

এখানে বলা দরকার যে আমি ধূমপায়ী নই। তাহলে চুরুট ধরিয়েছি নিজেকে সাহস জাগানোর জন্য? না, তাও নয়।এককালে কিছু রেড ইন্ডিয়ান ছিল, ভূত বা দুষ্ট আত্মাকে তাড়ানার জন্য তারা চুরুট ধরাত বলে শুনেছি। তবে আমার চুরুট ধরানোর সঙ্গে এটারও কোন সম্পর্ক নেই। আমার চুরুটে কিছু কেমিকেল আছে, সেগুলো নাকের ভেতর ঘ্রাণ শনাক্তকারী যন্ত্রপাতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। কেমিকেল তার কাজ শুরু করাতেই আমি আর তন্ময় বেশ কয়েকবার হাঁচি দিলাম।

যতই হাঁচি দিই, দুজনেই আমরা কান পেতে থাকলাম আর কেউ হাঁচি দেয় কি না শোনার জন্য। কিন্তু কই?

তন্ময়কে নিয়ে বাড়ির বাকি অংশ দেখতে বেরোলাম। সিড়ির ল্যান্ডিংয়ে আরেকটা দরজা দেখা গেল, আঁটো করে বন্ধ।

'ভাইজান', চোখ-মুখে বিস্ময় নিয়ে বলল তন্ময়,

''আমি এখানে প্রথম এসেই বাকি সব দরজার মতো এই দরজার তালাও খুলে দিয়েছিলাম। ভেতর থেকে এটার তালা লেগে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কারণ...'

তন্ময় ওর কথা শেষ করতে পারল না, দরজা নিজে থেকে নিঃশব্দে খুলে গেল-অথচ ওই মুহূর্তে ওটাতে আমাদের কারও হাত লাগেনি। পরস্পরের দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকালাম দুজন। দুজনের মাথায় একই চিন্তা খেলছে : এখানে মানুষের কোনো প্রতিনিধিত্ব ধরা পড়তে পারে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি, আমার পিছু নিয়ে তন্ময়ও ঢুকল।

আসবাবপত্র ছাড়া খালি একটা কামরা, থাকার মধ্যে এক কোণে ফাঁকা কয়েকটা বাক্স, দু-একটা পোঁটলা। একটাই মাত্র জানালা, খুব ছোট, ওটার কবাটও বন্ধ; বেরোনোর পথ একটাই, আমরা যে পথে ঢুকেছি।
কার্পেট নেই, মেঝেটা অত্যন্ত পুরোনা, উঁচু-নিচু, চটা ওঠা, কোথাও কোথাও

মেরামত করার দাগ কিন্তু কোনো জীবিত বা দৃশ্যমান প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই,এমন কিছুও নেই যেখানে কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছি, ওই একমাত্র দরজা আবার ভেলকি দেখাল, আমাদের চোখের সামনে যে-রকম নিঃশব্দে খুলেছিল ঠিক সেভাবেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।আমরা এখন ঘরটার ভেতর বন্দী।

এই প্রথমবার আতঙ্কে আমার ঘাড়ের পেছনটা শিরশির করে উঠল। তবে অকুতোভয় তন্ময় দেখলাম হাসছে।

ভাইজান, ওরা আমাদের আটকাতে চাইছে, এটা বোধহয় ঠিক না।

কারণ, ওই পলকা দরজা আমি এক লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলতে পারি।

"আগে হাত দিয়ে চেষ্টা করে দেখ খুলতে পারিস কি না," বললাম আমি, যে অস্বস্তি আমাকে পেয়ে বসতে যাচ্ছিল ঝেড়ে ফেলে দিলাম সেটা। 'আমি জানালার কবাট খুলি।'

তসলা সরিয়ে কবাট খুললাম। উকি দিয়ে দেখি, সরাসরি নিচে সেই পাকা উঠান, আগে যেটার বর্ণনা দিয়েছি। জানালার পর কোনো গোবরাট কিংবা কার্নিশ নেই, দেয়াল একেবারে খাড়া নেমে গছে। জানালা দিয়ে কোনো ভাবে বেরোতে চাইলে নিচের পাথরের মেঝে ছাড়া আর কোথাও পা রাখার জায়গা পাবে না ।

ইতিমধ্যে দরজা খুলতে গিয়ে গলদঘর্ম হওয়াই সার তন্ময়ের, হাত দিয়ে কোনোভাবেই সেটা খুলতে পারছেনা। আমার দিকে ফিরে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি চাইল সে।

এখানে আমি তন্ময়ের একটু প্রশংসা করতে চাই,তা না হল ওর প্রতি অবিচার করা হবে। ইস্পাত নয়, হিরেও নয়, টাইটেনিয়ামের মতো শক্ত ওর স্নায়ু।

অশরীরী অস্তিত্ব, অভিশপ্ত আত্মা, ভূত, পেত্নি,জিন্দালাশ, বদ জিন, খারাপ বাতাস-যেখানে যা কিছু আছে, কিছুই তন্ময়কে কণামাত্র বিচলিত করতে পারেনা। যেকোনো পরিস্থিতিতে শান্ত-স্বাভাবিক থাকার প্রকৃতি প্রদত্ত বিরল গুণের অধিকারী ও, যে গুণটির জন্য একদিকে ওর প্রতি আমার ভক্তি উথলে ওঠে, আরেক দিকে ওকে আমি ক্ষীণ হলেও ঈর্ষা করি।

অনুমতি দিয়ে ওকে আমি বললাম, ‘তোর যেটা ভালো মনে হয় কর।’

তন্ময় তাগড়া জওয়ান, গায়ে আসুরিক শক্তি, ওর প্রচন্ড লাথিতে দরজাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল-অন্তত কল্পনায় এই দৃশ্যই দেখতে পেলাম আমি,কিন্তু বাস্তবে ওর ওই লাথি দরজাটাকে একটু কাঁপাতে পর্যন্ত পারল না। দুবার, পাঁচবার, অসংখ্যবার-ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত তন্ময় হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে, সম্পূর্ণ পরাজিত।

শিষ্য যেখানে ব্যর্থ, গুরু সেখানে সফল হতে বাধ্য,

এটাই তো দস্তুর, নাকি? কাজেই এবার আমাকে হাত লাগাতে হলো। অনেক ভাবে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথাই, শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে স্বীকার করলাম,এটা খোলা অন্তত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

"মোবাইল বের কর, তন্ময়," অবশেষে ওকে বললাম আমি। 'দমকল অফিসে কিংবা পুলিশ স্টেশনে খবর দে, ওরা এসে দরজা ভেঙে আমাদের উদ্ধার করুক।'

'এখনই, ভাইজান?' তাকিয়ে দেখি তন্ময় হাসছে না।

মেঝেতে বসে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছি,আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এবার আগের চেয়ে ঠান্ডা আর জেদি একটা ঘটনা ঘটছে। যেমন অদ্ভুত তেমনি রোমহর্ষক। এবড়োখেবড়ো মেঝে থেকে বাষ্পীয় বা ধোঁয়াটে কিছু উঠে আসছে, ঘরের বাতাসে মিশে দ্রুত বিষাক্ত করে তুলছে সেটাকে। সন্দেহ নেই ওই বিষ মানুষের জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

তারপর হঠাৎ দেখি দরজাটা এখন আবার নিজে থেকে, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে সিধে হলাম আমরা, ছুটে বেরিয়ে এলাম ল্যান্ডিংয়ে। দুজনেই বড়সড় একটা নিস্তেজ আলো দেখতে পেলাম- একটা মানুষ যত বড় হয় তত বড়, তবে আকৃতিবিহীন এবং বস্তুবিহীন-আমাদের আগে আগে এগোচ্ছে, অর্থাৎ সিড়ির ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে, যাচ্ছে চিলেকোঠার দিকে।

ওই আলোর পিছু নিলাম আমি, তন্ময় আমার পিছু নিল।

৩

ছোট চিলেকোঠায় পৌছাল সচল আলো, দেখলাম ছাদে বেরোনোর দরজা খোলা রয়েছে। প্রায় একই সঙ্গে আমিও চিলেকোঠায় পৌঁছেছি, আমার চোখের সামনে অত বড় আলোটা ছোট হতে হতে গোল একটা ফোঁটায় পরিণত হলো, এক কোণে ফেলা বিছানায় খানিক বিশ্রাম নিল, চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে উজ্জ্বল থেকে আরও উজ্জ্বল, স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্ট হচ্ছে, কাঁপছে, তারপর এক পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এগিয়ে গিয়ে বিছানাটা পরীক্ষা করলাম আমরা।

খাট নয়, চৌকি, তার ওপর কাঁথা বালিশ পড়ে আছে। এটা সম্ভবত কোনো কালে বাড়ির চাকরবাকরেরা ব্যবহার করত। কাছেই ছোট একটা পুরানো আলমারি, আধখোলা দেরাজের ভেতর রংচটা সিল্কের রুমাল দেখতে পেলাম, ধুলোয় প্রায় ঢাকা: ওটার গায়ে ফুল তোলা হচ্ছিল, সুঁইটা এখনো অসম্পূর্ণ নকশায় গাঁথা অবস্থায় রয়ে গেছে। যে বৃদ্ধা কদিন আগে এই বাড়িতে শেষবার মারা গেছেন, এটা হয়তো তাঁর,হয়তো এই কামরাতই তিনি ঘুমাতেন।

কৌতূহল দমিয়ে রাখা সম্ভব হলো না, এক এক করে বাকি দেরাজগুলোও খুললাম। নারীর পরিধেয় টুকটাক জিনিস সব। দুটো চিঠি পেলাম, গোল পাকিয়ে রাবারের সরু রিবন দিয়ে আটকানো, রিবনগুলো কালের আচড়ে

হলুদ হয়ে গেছে। জানি পরের চিঠি পড়তে নেই, কিন্তু এখানে আমার ভূমিকা বেসরকারি গোয়েন্দার মতো, নিজেকে কিছুটা স্বাধীনতা না দিয়ে পারছি না। চিঠি দুটো নিজের দখলে নিলাম।

চিলেকোঠার ওই কামরায় খেয়াল করার মতো আর কিছু পেলাম না আমরা, আলোটাও ফিরে এল না, তবে পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য ঘোরার সময় পরিষ্কার শুনতে পেলাম মেঝেতে ছোট বাচ্চার পায়ের শব্দ হচ্ছে, ঠিক আমাদের সামনে।

চিলেকোঠায় একটা নয়, সব মিলিয়ে ছোট ছোট চারটে কামরা। বাকি তিনটেতেও গেলাম আমরা, আমাদের সামনে থেকে এখনো পায়ের শব্দ উঠে আসছে। কিছুই দেখছি না, অথচ স্পষ্ট পদশব্দ শুনছি।

সিড়ি বেয়ে নামার সময় চিঠি দুটো আমার হাতে রয়েছে, হঠাৎ পরিষ্কার অনুভব করলাম ওই হাতের কবজি চেপে ধরল কেউ, দুর্বল আঙুল দিয়ে চেষ্টা করল আমার মুঠো থেকে চিঠিগুলো টেনে নিতে। ওগুলো আরও শক্ত করে ধরলাম আমি, চেষ্টাটা থেমে গেল।

আমার শোয়ার ঘরে ফিরে এলাম। এতক্ষণে উপলব্ধি করলাম কুজো আমাদের পিছু নেয়নি, খেলাঘরের সামনে যে মোমটা জ্বলছে, ওটার পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

চিঠি পড়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। শুরু করার আগে আমি আমার পিস্তলটা তন্ময়কে দিয়ে বললাম, নিরাপদ এবং কাছাকাছি কোথাও রাখতে হবে। ছোট একটা কাঠের বাক্স দেখাল ও, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম। পিস্তল ও ছুরি তাতে ভরে টেবিলের ওপর রাখল ও, সেটা বিছানার মাথার দিকে। তারপর কুজোকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । তবে তাতে খুব একটা সুবিধে করতে পারছে বলে মনে হলো না।

চিঠিগুলো ছোট, দুটোতেই তারিখ দেওয়া আছে, লেখা হয়েছে আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৭১ সালে। এগুলো প্রেমিকাকে লেখা কোনো প্রেমিকের, কিংবা তরুণী স্ত্রীকে লেখা কোনো স্বামীর চিঠি।

শুধু প্রকাশিত হাবভাবে নয়, আগের কোনো ভ্রমণ বা অভিযাত্রার প্রসঙ্গ থাকায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় চিঠির লেখক একজন নাবিক হতে পারেন, কিংবা নৌ-পথে ভ্রমণে অভ্যস্ত হতে পারেন।

প্রায় প্রতি শব্দের বানান ভুল এবং হাতের লেখা কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং, সাক্ষ্য দিচ্ছে লেখকের লেখাপড়া মোটেও নিখুঁত ছিল না, তবে ভাষায় মনের জোরাল আকাঙ্ক্ষা ভালোই প্রকাশ পেয়েছে। আকর্ষণ বোঝাতে গিয়ে চিঠির লেখক ফাঁস করে ফেলেছেন এক ধরনের বুনো ভালোবাসা। তবে, এখানে-সেখানে অস্পষ্ট কিছু ইঙ্গিত, প্রেম সম্পর্কিত নয়, যেন গোপন কিছু বলতে চাওয়া হয়েছে, সম্ভবত গুরুতর কোনো অপরাধ সম্পর্কে। ভাষাটা খুবই বাজে।

‘পরস্পরকে আমাদের পেয়ার করিতে হইবে’ এরকম একটা লাইন আছে চিঠিতে, ‘কারণ সব জানাজানি হইয়া গেলে সবাই শুধু অভিশাপই দেবে আমাদের।’ আরেক জায়গায় আছে,– ‘রাত্রিবেলা তুমি অন্য কাউকে নিজের ঘরে শুইতে নিবে না-কারণ নিদের মধ্যে তোমার কথা বলিবার অভ্যাস।’ আরেক জায়গায়, ‘যা হবার হইয়া গেছে, আমি তোমাকে গেরান্টি দিয়ে কইতেছি, আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই সাবুদ করা সম্ভব হোবে না, যদি না মরা মানুষগুলো আবার জ্যান্ত হয়ে ফিইরে আসে।’

এখানে সুন্দর হস্তাক্ষরে[মেয়েলি] একটি বাক্য যোগ করা হয়েছে, বাক্যের নিচে রেখা টানা : ‘মুই জানি, ওরা ফিরে এসেছে!’

শেষ চিঠির শেষদিকে ওই একই নারী এই কথাগুলো লিখেছেন : ‘জুন মাসের ৪ তারিখে সাগরে নিখোঁজ, হেই একই দিন...’

পড়া শেষ করে কী পড়লাম তাই নিয়ে ভাবছি।

ভয় হলো মাথায় যে চিন্তা ঢুকেছে সেটা আমার স্নায়ুকে দুর্বল করে দিতে পারে। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাতের বাকি অংশে যে জাদু বা যে বিস্ময়ের মুখেই পড়ি না কেন, নিজেকে কাবু কিংবা আতঙ্কিত হতে দেব না। আর সেজন্য দরকার তন্ময়ের মতো শক্ত স্নায়ু। দুটো মোমই শেষ হয়ে এসেছে, আরও দুটো জ্বালতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। চিঠি দুটো টেবিলের ওপর পড়ে থাকল । দুই মিনিট পায়চারি করে নতুন মোম জ্বালালাম।

পকেট থেকে বইটা বের করে আবার বসলাম আরামকদারায়।

কোনোরকম অশান্তি ছাড়াই পৌনে এগারোটা পর্যন্ত পড়লাম। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

কাপড়চোপড় ছাড়িনি। তন্ময়কে বললাম, 'নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়, তবে অবশ্যই জেগে থাকবি।' দুই ঘরের মাঝখানের দরজা খুলে চলে যেতে দেখলাম ওকে।

নিজের কামরায় আমি এখন একা। আমার মাথার কাছে, নাগালের মধ্যে, টেবিলের ওপর অস্ত্রসহ বাক্সটা রয়েছে। বাক্স থেকে পিস্তল নিয়ে বালিশের তলায় রাখলাম। টেবিলের ওপর একটা নয়, দুটো মোমবাতি জ্বলছে। ওগুলোর সামনে হাতঘড়ি আর মোবাইল ফোনটা রাখলাম। তারপর অবার ডুবে গেলাম ট্রটস্কি হত্যাকাণ্ডে।

আমার উল্টোদিকে খেলনাঘর, ওটার সামনেও একটা মোম জ্বলছে। কাছাকাছি ছোট্ট কার্পেটে শুয়ে রয়েছে কুজো, মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে। আরও প্রায় বিশ মিনিট পর হঠাৎ প্রায় চমকে উঠতে হলো। অনুভব করলাম অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা মারল আমার মুখে, ছোটখাটো দমকা হাওয়ার মতো। আমার ডানদিকে সিড়িতে বেরোনোর দরজার দিকে তাকাচ্ছি,

ভাবছি নিশ্চয়ই খুলে গেছে ওটা-কিন্তু না, ওটা বন্ধ।

এবার আমি নিজের বা দিকে তাকালাম । দেখলাম মোমের শিখাগুলো ভয়ানক অস্থির, যেন এলোমেলো বাতাস পাচ্ছে। ওই একই সময় আমার হাতঘড়ি, টর্চ আর মোবাইল ফোনটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর হড়কাতে শুরু করল, তারপর একদম গায়েব। অদৃশ্য কোনো হাতের কারসাজি ছাড়া আর কী বলব জানি না।

ঝট করে উঠে বসলাম বিছানায়, বালিশের তলা থেকে পিস্তল টেনে নিলাম, অপর হাতে নিলাম ছুরিটা-চাইছি না ওগুলোও হাতঘড়ি আর মোবাইল ফোনের পরিণতি বরণ করুক। এ রকম সশস্ত্র অবস্থায় মেঝের চারদিকে তাকাচ্ছি আমি, কিন্তু ঘড়ি বা মোবাইলের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলাম না কোথাও, আর ঠিক তখন স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ঠক-ঠক-ঠক, সামান্য বিরতি দিয় তিনবার নক করার শব্দ।

পাশের কামরা থেকে তন্ময় জানতে চাইল, ‘ভাইজান, আপনি?’

‘না; সতর্ক থাক।’

নক করার আওয়াজেই বোধহয় কুজোর ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে বসেছে, কান দুটো দ্রুত এবং ঘন ঘন আগুপিছু করছে। কুকুরটা আমার দিকে এমন এক আশ্চর্য স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আমার সমস্ত মনোযোগ ওর দিকে দিতে বাধ্য হলাম। ধীরে ধীরে দাড়াল সে, আমার চোখের সামনে তার গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। সেই বুনো দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখছে সে, দাঁড়িয়ে আছে যেন একটা নিষ্প্রাণ অটল মূর্তি।

কিন্তু কুজোর ব্যাপারটা বোঝার জন্য অমি আর সময় দিতে পারলাম না, কারণ পাশের কামরা থেকে হাজির হলো তন্ময়। কোনো মানুষের মুখে আমি যদি কখনো আতঙ্ক দেখে থাকি, সেটা ওই মুহুর্তে। রাস্তায় দেখা হলে ওকে আমি সত্যি চিনতে পারতাম না, ওর মুখের রেখা আর ধাঁচ এতটাই বদলে গেছে।

আমাকে দ্রুত পাশ কাটাল তন্ময়, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে চাইছে না এমন সুরে বলল,’পালান, পালান! আমাকে ওটা ধরতে আসছে।!’

সিড়িতে বেরোনোর বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছাল তন্ময়, খুলল ওটা, লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। সচেতন কোনো চিন্তা ছাড়াই ওর পিছু নিয়ে ল্যান্ডিংয়ে বেরোলাম আমি, গলা চড়িয়ে থামতে বলছি ওকে কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে লাফাতে লাফাতে সিড়ির ধাপ বেয়ে নেমে যাচ্ছে তন্ময়, রেলিং ধরে রেখে প্রায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে শরীরটাকে, প্রতিবার তিন-চারটে করে ধাপ পেরোচ্ছে।

আমি আমার দাঁড়ানোর জায়গা থেকে শুনতে পেলাম সদর দরজা খুলে গেল, তারপর আবার সেটা দড়াম করে বন্ধ হলো। এ আমার কল্পনারও অতীত।

ভুলেও কখনো ভাবিনি তন্ময় আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবে। কী দেখল ও? কিসে এত ভয় পেল?

বাড়িটায় এখন আমি একা।

একবার ভাবলাম তন্ময়ের পিছু নিয়ে আমিও বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে। তবে সেটা মাত্র এক মুহুর্তের দ্বিধা। আমি আমার গর্ব এবং কৌতূহল, দুটোকেই চিরকাল প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত, আর ওগুলোই আমাকে চলে যেত বাধা দিল।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম, দরজা বন্ধ করলাম,সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছি পাশের ঘরে যাওয়ার খা়োলা দরজার দিকে। কী আছে ওখানে? তন্ময়ের মতো ডাকাবুকো ছেলে অমন ভয় পাবে কেন?

সাবধানে, পা টিপ টিপে এগোচ্ছি। আমাকে দেখতেই হবে তন্ময়ের ঘরে কী আছে। ঢুকলাম ভেতরে। কিছুই ঘটল না। চারদিকে চোখ বুলিয়ে

আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু দেখছিও না।

আবারও ঘরটার দেয়ালগুলো খুটিয়ে পরীক্ষা করলাম, জানতে চেষ্টা করছি কোথাও কোনো গোপন দরজা অছে কি না। তারপর মেঝেটাও পরীক্ষা করলাম। সন্দেহজনক কিছু পাচ্ছি না। বাড়ির ভেতর সবগুলো দেয়াল ম্লান খয়েরি ওয়ালপেপার দিয়ে ঢাকা,সেই আবরণের কোথাও এক বিন্দু ভাঁজ পর্যন্ত নেই।

তাহলে কী সেই জিনিস, যা ভয় দেখাল তন্ময়কে?

আমার কামরা থেকে যদি না হয়, তাহলে অন্য কোন পথে তন্ময়ের ঘরে ঢুকল?

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। মাঝখানের দরজা বন্ধ করে তালা লাগালাম। খেলনাঘরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছি সতর্ক এবং প্রস্তুত।

কুকুরটা কখন যেন কামরার এক কোণে গিয়ে ঠাই নিয়েছে, দেয়ালের গায়ে তার সেঁটে থাকার ভঙ্গিটা অদ্ভুত, যেন আক্ষরিক অর্থেই ভেতরে সেঁধিয় যেতে চাইছে। শান্ত পায়ে এগোলাম ওর দিকে, নরম সুরে অভয় দিলাম।

বোঝাই যাচ্ছে বেচারা অবলা প্রাণীটি ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে। আমাকে এগোতে দেখে সবগুলো দাঁত বের করে মেজাজ দেখাল, চোয়াল থেকে লালা ঝরছে, আমি ছুঁতে গেলে নির্ঘাৎ কামড়ে দিত।দেখে মনে হলো না চিনতে পারছে আমাকে। চিড়িয়াখানায় তোমরা যদি কেউ সাপের সামনে খরগোশকে সম্মোাহিত অবস্থায় দেখে থাকো, কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাহলে খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে কুকুরটা কী রকম

সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিল। কুজোকে শান্ত করার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, আমি ভয় পেলাম জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে কামড়

দিলে সেটা যেমন মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়, ও যদি এই আধপাগলা অবস্থায় আমাকে কামড় দেয় তাহলে সেটার বিষও খুব বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিতে পারে। ওকে একা থাকতে দিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এলাম, অস্ত্রগুলো জায়গামতা রাখলাম, তারপর চেয়ারে বসে আবার খুললাম বইটা।

আমি সাহস দেখাতে পারছি, মাথাও ঠান্ডা রাখতে পারছি, অথচ সেজন্য কোনো কৃতিত্ব দাবি করছি না,

এটা দেখে প্রিয় পাঠক তোমরা ভাবত পারো পরিস্থিতির অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিচ্ছি আমি, কিংবা বাস্তবে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপলেও লেখার সময় সেটা

বেমালুম চেপে যাচ্ছি। ব্যাপারটা আসলে সে রকম কিছু নয়। সবার সম্মতি চেয়ে নিয়ে প্রসঙ্গটা নিয়ে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই ।

আমার উপস্থিত বুদ্ধি, কিংবা যেটাকে সাহস বলা হয়, তা আমি অর্জন করেছি এই একই রকমের একাধিক পরিস্থিতি থেকে, অর্থাৎ এ রকম পরিস্থিতি আমার পরিচিত। সবাই জানে পরিচিতি আড়ষ্টতা এবং অমূলক ভয় অনেকটাই দূর করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সবটুকু। যেখানে ভূতের উপদ্রব, সেখানেই দৌড়েছি আমি, আমার ডাক্তারি বা শখের গোয়েন্দাগিরিতে ফাঁকি দিত কার্পণ্য করিনি। প্লানচেট কিংবা আত্মাদের নিয়ে যত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, সবকিছুতে অংশ নেওয়া হয়েছে আমার। ভুডু সম্পর্কে জানি, জানি তুক-তাক কী, চাল পড়া কী, জাদু কী, জানি এসব বিষয়ে বিজ্ঞান কী বলে। শুধু দেশে নয়, এসব নিয়ে বিদেশে কোথায় কী চর্চা হচ্ছে তার খবর রাখি, কোথাও কোথাও গেছিও।

আমি মিরাকলে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি মানুষকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেওয়ার শক্তি কারও কারও সত্যি আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় অসাধারণ

সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, সেসব এতটাই বিচিত্র, আমি বর্ণনা করলে তোমরা বিশ্বাস করবে না কিংবা অলৌকিক বলে উড়িয়ে দেবে।

কিছু অবিশ্বাস করা আমার ধর্ম নয়। কেন নয়,সেটা এখানে একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এই দুনিয়া না দেখলে এই বিশ্ব বা এর কিছুই আমি বিশ্বাস করতাম না । তার মানে তো এই নয় যে অমি দেখতে না পেলে এই মহাবিশ্ব থাকত না। দেখতে না পাওয়াটাই বা দেখতে না পারাটাই প্রমাণ করে না যে

জিনিসটা নেই। কাজেই আমি নিজেকে প্রশ্ন করি : একধরনের প্রাণ সম্ভব হলে অন্য ধরনের প্রাণও সম্ভব?

চোখে দেখতে পাওয়া যায় এমন প্রাণ সম্ভব হলে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না এমন প্রাণও সম্ভব? এক দুনিয়া সম্ভব হলে আরেক দুনিয়াও সম্ভব? এভাবে যুক্তি দিয়ে সাজালে দেখতে পাই আমার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে।

এই প্রসারণের কোনো সীমা নেই। নিজেকে বুঝতে হলে বিশ্বকে বুঝতে হবে, বিশ্বকে বুঝতে হলে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিতে হবে। কৃতিত্ব দিতে হবে প্রাণ আর চিন্তাশক্তিকে। এই দুটো আমারও আছে, আর তাই আমি সবকিছু বিশ্বাস করি। সব মানে, যা চোখে দেখনি, তাও। চার হাত-পা বিশিষ্ট মানুষ থাকলে দুই হাত-পা বিশিষ্টি মানুষও সম্ভব। যারা মানুষের মতো দেখতে, তাদের বৃদ্ধি থাকলে যারা মানুষের মতো দেখতে নয়,

তাদেরও বুদ্ধি থাকতে পারে। মানুষ চোখের পলকে অনেক কিছু চিন্তা করতে পারে, মানুষ চোখের পলকে অনেক দূর চলেও যেতে পারে। একই মানুষের পক্ষে একই সময়ে একাধিক জায়গায় উপস্থিত থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে। মানুষ অতীতের ঘটনা যেমন বলে দিতে পারে,তেমনি ভবিষ্যতও দেখতে পায়, এমনকি এই দুই কালে তার পক্ষে বেড়ানোও অসম্ভব নয়।

কিছুই অসম্ভব নয়।আবার এক অর্থে গোটাটাই অসম্ভব। যদি আমি না জন্মাতাম। আমি না জন্মালে কেউ আমাকে কিছু বিশ্বাস করাতে পারত না। জন্ম হওয়ায় আমি এখন কিছুই। অবিশ্বাস করি না, করার যুক্তি নেই। এটা, যেমনই হোক, যদি থাকে-তাহলে ওটা, যেমনই হোক, আছে।

এবার অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে আমার থিওরিটা বলি। অতিপ্রাকৃত অসম্ভব নয়, তবে প্রথমে বুঝতে হবে যেটাকে অতিপ্রাকৃত বা সুপারন্যাচারাল বলা হচ্ছে,সেটা আসলে কী। আমরা শুধু তখনই অতিপ্রাকৃত শব্দটি ব্যবহার করি যখন এ-সংক্রান্ত প্রকৃতির বিধিবিধান বুঝতে পারি না। কাজেই এখন যদি একটা ভূত আমার সামনে সটান খাড়া হয়ে যায়, আমার এ কথা বলার অধিকার নেই, 'আচ্ছা, অতিপ্রাকৃত তাহলে সম্ভব। বরং বলা উচিত হবে, 'আচ্ছা, ভূতর আগমন তাহলে, প্রচলিত ধারণার বিপরীতে, প্রকৃতির বিধান অনুসারে ঘটে, কাজেই তা অতিপ্রাকৃত নয়। এখন পর্যন্ত আমি যৎটুকু বুঝেছি এবং তন্ত্র-মন্ত্র আর জাদুবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপেশাদাররা সত্য বা বিস্ময় হিসেবে যা কিছু রেকর্ড করেছেন, তার সঙ্গে জাগতিক প্রাণের কোনাে না কোনো ভূমিকা সব সময় দরকার হয়েছে। শুধু উপমহাদেশে

নয়, দুনিয়ার বহু জায়গায় এমন জাদুকর এখনো পাওয়া যাবে, যাদের দাবি তারা আত্মাকে জাগাতে বা ডেকে আনতে পারেন।

তর্কের খাতিরে আপাতত ধরে নেওয়া যাক তাঁদের দাবি সত্য এবং সেখানেও জাদুকরের জাগতিক অস্তিত্ব উপস্থিত দেখতে পাব আমরা, অর্থাৎ তিনি বস্তুর প্রতিনিধি বা উপাদান, যার কাছ থেকে অদ্ভুত কিছু গঠিত হওয়ার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে,

যার দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা হচ্ছে, সেগুলো যাতে তোমার স্বাভাবিক অনুভূতি আর বোধবুদ্ধিতে ধরা পড়ার উপযোগী হয়। আত্মার জবানবন্দি বা সাক্ষ্য নামে একটা ব্যাপার প্রায় সব দেশেই আছে, তাও সত্য বলে ধরে নেওয়া যাক; গান হোক, শুধু শব্দ হোক, কাগজের ওপর লেখা হোক-দৃষ্টিগোচর কোনো হাত এসব করছে না; মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই আসবাবপত্র নড়াচড়া করছে, কিংবা সত্যি সত্যি হাত দেখতে পাওয়া বা হাতের স্পর্শ পাওয়া, যে হাতের সঙ্গে কোনো শরীর আছে বলে মনে হয় না-কিন্তু তারপরও নিশ্চয়ই সেখানে মাধ্যম কিংবা জীবিত প্রাণ পাওয়া যাবে, বস্তুর উপাদানসহ, যিনি এসব সংকেত সংগ্রহ ও অনুবাদ করার যোগ্যতা রাখেন।

এ ধরনের প্রতিটি বিস্ময়কর ঘটনায়, ধরা যাক সেখানে কোনো ধোঁকাবাজি ছিল না, তবে নিশ্চয়ই আমাদের মতো কোনো মানুষ ছিল, যার দ্বারা কিংবা যার মাধ্যমে, মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে ফলাফল। এটা গত যুগের

মেসমেরিজম আর বর্তমান যুগের সম্মোহন, কিংবা ইলেক্ট্রো-বায়োলজি সম্পর্কেও খাটে; যে ব্যক্তির অপারেশন করা হবে তার মনকে প্রভাবিত করছে বস্তবরগত উপাদান নিয়ে তৈরি একটা অস্তিত্ব। ধরা যাক, এটা সত্য যে একজন সম্মোাহিত রোগী ১০০ মাইল দূর থেকে সম্মোহনকারীর ইচ্ছায় সাড়া দিচ্ছে। এখানে জাগতিক কোনো অস্তিতবের সংশ্লিষ্টতা যদি না থাকে, হয়তো জাগতিক কোনো তরলতার ভূমিকা আছে-তোমরা সেটাকে ইলেকট্রিক কিংবা ওড়িক, কিংবা অন্য যা খুশি বলতে পারো-যার বিস্তার স্পেস এবং বিঘ্ন অতিক্রম করার ক্ষমতা আছে এবং জাগতিক ক্রিয়া একটার সঙ্গে আরেকটা সংযোােগে রক্ষা করেছে। কাজেই এই আশ্চর্য হানাবাড়িতে এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি আমি, এবং আরও যা দেখতে পাব বলে আশা করছি, সবই আমার মতো মরণশীল কোনো জাগতিক প্রতিনিধি বা মাধ্যমের কারসাজি বলে ধারণা করছি। হ্যাঁ, আমার এই ধারণাই আমাকে ভয় না পেতে সাহায্য করছে। যারা অতিপ্রাকৃত বিষয়কে প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মকান্ড হিসেবে মেনে নিতে পারে না, তাদের কাছে আমার আজ রাতের অভিজ্ঞতা স্রেফ গুল-গপ্পো বলে মনে হতে পারে, আবার কেউ হয়তো এতটা প্রভাবিত হবে যে মুহূর্তে মুহূর্তে তার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাবে।

আমার বিশ্বাস এবং উপলব্ধি হলো : এখন পর্যন্ত যা আমাকে দেখানো হয়েছে এবং রাতের বাকি অংশে আরও যা কিছু দেখানো হবে, তার জন্য আমার মতো কোনো মানুষই দায়ী এবং প্রকৃতির দান হিসেবে এসব দেখাতে

পারার বিশেষ ক্ষমতা তাঁর আছে। শুধু তা-ই নয়, এসব দেখানোর পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা কারণও আছে তাঁর-না থেকে পারে না।

বেশ অনুভব করছি, আমার এই থিওরির মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে, সেটা যতটা না কুসংস্কারপ্রবণ, তারচেয়ে অনেক বেশি দার্শনিকসুলভ আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে পারি মনজোড়া প্রশান্তি নিয়ে ঠিক অপেক্ষায় আছি এরপর কী ঘটে দেখার জন্য, বাস্তব ক্ষেত্রে একজন রসায়নবিদ যেভাব দুর্লভ এবং বিপজ্জনক রাসায়নিকের মিশ্রণ ঘটানোর পর ঠান্ডা মাথায় অপেক্ষা করেন ফলাফল দেখার জন্য।

এটা অবশ্য ঠিক, যে উদ্ভট ঘটনা ঘটে গেছে, সেগুলোর ব্যাপারে মনটাকে নির্লিপ্ত রাখতে পারলে আমার পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বাড়বে। আমি তাই বইয়ের পৃষ্ঠায় শুধু চোখ নয়, মনও ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

কিন্তু দেখলাম আমার চেয়েও এককাঠি সরেস কেউ উপস্থিত আছে এখানে।

৪

এখন আমি সচেতন, বইয়ের পাতা আর আলোরন মাঝখানে কিছু একটা ঢুকে পড়েছে-ছায়া পড়েছে পাতায়। ঝট করে মুখ তুললাম, এবং তারপর যা

দেখলাম, সেটা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন, সম্ভবত অসম্ভব।

ওটা অন্ধকার, শূন্য নিজে থেকেই আকার পাচ্ছে, বাইরের রেখাগুলো একদমই স্পষ্ট নয়। এ কথা আমি বলতে পারি না যে ওটা মানুষের আকৃতি, অথচ অন্যকিছুর চেয়ে মানুষের যে কাঠামো বা গঠন সে রকম

একটা ছায়ার সঙ্গেই বেশি মিল। ওটা যখন দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশের বাতাস এবং আলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং স্পষ্ট, চোখে বিশাল লাগছে ওটার বিস্তার, চুড়াটা সিলিং প্রায় ছুঁইছুঁই করছে।

ওটার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় প্রচণ্ড শীত কাবু করে ফেলল আমাকে। আমার সামনে প্রকাণ্ড হিমশৈল থাকলেও এতটা শীতে কাঁপতাম না আমি, কোনো হিমশৈলের শীতলতা এ রকম কায়িক হওয়াও সম্ভব নয়। আমার উপলব্ধিতে পরিষ্কার ধরা পড়ছে, এই কাঁপুনি বা শীতের উৎস ভয় নয়।

ওটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছি না, তারপর মনে হলো-তবে এটা আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারব না-ওপর থেকে যেন একজোড়া চোখ দৃষ্টি নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। একবার যদি মনে হয় ওগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, পরমুহূর্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তারপরও ওই উঁচু চূড়ার, যেখানে একজোড়া চোখ আছে বলে একবার বিশ্বাস আরেকবার অবিশ্বাস করছি, অন্ধকার থেকে প্রায়ই ছিটকে বেরিয়ে আসছে ম্লান নীল দুটো রশ্মি।

ওটার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইলাম, কিন্তু দেখলাম গলার ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছে না; আমি শুধু নিজের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারছি : আমি কি ভয় পেয়ে এসব কল্পনা করছি?

না-আ! এসব আমার কল্পনা হয় কী করে! উঠে দাঁড়াতে চাইলাম, কিন্তু তাও বৃথা চেষ্টা; অনুভব করলাম অপ্রতিরোধ্য একটা শক্তি চেয়ারের সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে আমাকে। শুধু তা-ই নয়, পরিষ্কার বুঝতে পারছি, সেই অদৃশ্য ক্ষমতা আমার স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাশক্তিকেও বাধা দিচ্ছে। ওটার সঙ্গে পেরে ওঠার সাধ্য কোনো মানুষের নেই, এটা বুঝতে পেরে অসহায়ত্ব আর অক্ষমতা ভর করল আমার ওপর, যে ধরনের অক্ষমতা সাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠলে নাবিকেরা অনুভব করেন কিংবা একজন পাইলট যখন বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য আরেকটা ইচ্ছা কাজ করছে, সেটার শক্তি অনেক বেশি; আর সব বস্তুর চেয়ে ঝড়, আগুন, সুনামি এবং হিংস্র পশুর শক্তি যেমন অনেক বেশি। ভাবলাম, তবে কি প্রথমে আমাকে দুর্বল করে নেওয়া হচ্ছে? তারপর ভয়ংকর, চরম কিছু একটা ঘটবে?

শক্তিহীন আমি অপেক্ষায় থাকলাম।

নতুন কিছু ঘটল না আর কিছু ঘটার দরকারও ছিল না, শূন্যে ভাসমান ওই অন্ধকার আকৃতি আমার শরীর ও মনে নিজের যে ক্ষমতা ফলাচ্ছে রক্ত-মাংসের যেকোনো মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলার জন্য সেটাই যথেষ্ট। সে এমন এক মাত্রার আতঙ্ক, কথা দিয়ে তা কাউকে বোঝানো অসম্ভব।

এত কিছুর পরও আমি সাহস যদি না-ও ধরে রাখতে পারি, গর্ব ঠিকই ধরে রেখেছি-নিজেকে বললাম, 'এটা আতঙ্ক, ঠিক আছে, তবে ভয় অন্য জিনিস; আমি যদি ভয় না পাই, কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না; আমার যুক্তি এসব মানে না, এটা স্রেফ দৃষ্টিভ্রম, একটা মায়া-আমি ভয় পাই না।'

আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার প্রবল চেষ্টায় সাড়া দিল আমার হাত, পিস্তলটা বের করার জন্য একদিকে ঝুঁকে বালিশের তলায় হাত ঢোকাতে যাচ্ছি। তখনই আমার হাত আর কাঁধে আশ্চর্য একটা ধাক্কা লাগল, মুহূর্তের জন্য কাধ পর্যন্ত ওই হাত প্রায় অবশ হয়ে গেল।

আমাকে আরও বেশি আতঙ্কিত করার জন্য এবার নতুন একটা চাল চালা হলো। সব কটা মোমের আলো ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ওগুলো নিভছে না, অত্যন্ত ধীরগতিত শুধু প্রতিটি শিখা ছোট হয়ে আসছে। দু-তিন মিনিটের মধ্য কামরাটা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। অন্ধকারে থাকা, সেই নিকষ কালো অন্ধকার জিনিসকে সঙ্গে নিয়ে, আমার গা ছমছম করতে লাগল।

ওই জিনিসটার ক্ষমতা এত বেশি অনুভব করছি,স্নায়ুতে তার একটা প্রভাব না পড়ে পার না। আসলে আতঙ্ক এমন এক চরম মাত্রায় পৌঁছেছে, হয় আমি বোধবুদ্ধিহীন উম্মাদ হয়ে যাব, তা না হলে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসব ঘোর লাগা এই অবস্থা বা জাদু থেকে।

বিস্ফোরিত হয়েই বেরিয়ে এলাম। নিজের কণ্ঠস্বর ফিরে পেলাম, যদিও সেটা প্রায় বিরতিহীন গলা ফাটানো মাত্র। চিৎকার করে বলছি : 'আমি ভয় পাই না, আমার আত্মা ভয় পায় না!'

হঠাৎ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি অনুভব করলাম শরীরে। অন্ধকারের ভেতরই দুটোর মধ্যে একটা জানালার দিকে এগোলাম, হ্যাচকা টান দিয়ে পর্দা সরালাম, কবাট খুললাম, আমার মাথায় শুধু তখন একটা মাত্র শব্দ-আলো।

তারপর যখন ওপর আকাশে চাঁদ দেখলাম।পরিষ্কার, শান্ত এবং আনন্দের এমন একটা বন্যা আমাকে ভাসিয়ে নিল, যেটা খানিক আগের আতঙ্কটাকে পুষিয়ে দেওয়ার মতো। ওই তো ওখানে ঝলমল করছে চাঁদ, ওই তা জনশূন্য ঘুমকাতরে চিরচেনা ভূতের গলির একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৈদ্যুতিক খাম্বা।

কামরার দিকে তাকানোর জন্য ঘুরলাম আমি। চাঁদ তার কাস্তে আকৃতি নিয়ে যে সামান্য আলো ছড়াচ্ছে সেটা ঘরের গাঢ় ছায়া খুব একটা ভেদ করতে পারেনি।তবে কিছুটা আলো পাচ্ছি বৈকি। অন্ধকার জিনিসটা,

তা সেটা যা-ই হোক, চলে গেছে-কিন্তু তারপরও আমি উল্টা দিকের দেয়ালে একটা অস্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। ছায়ার ছায়া বললে তোমরা কেউ কি কিছু বুঝবে? চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তে ঝট করে টেবিলের ওপর তাকালাম।

ওটার তলার দিক থেকে উঠে আসছে হাতটা। না, আমি ভুল দেখিনি বা তোমরা ভুল পড়ছে না, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা হাত টেবিলের ওপর উঠল। সম্পূর্ণ নয়, ওটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে শুধু কবজি পর্যন্ত।

টেবিলটা সম্পর্কে বলা দরকার। চকচকে কালচে চকলেট রঙের পুরোনো মেহগনি কাঠ, গোলাকার,নিরাবরণ।

হাতটা, যেকোনো বিচারে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, আমার হাতের মতোই রক্ত এবং মাংসের। যতটুকু দেখা যাচছে ততটুকু অক্ষত। তবে ওটা বয়ষ্ক কারও হবে। সরু,ভাঁজ পড়া, আকারেও ছোট-কোনো নারীর হাত। হাতটা খুব নরম ভঙ্গিতে টেবিলে পড়ে থাকা চিঠি দুটো মুঠোয় ভরল-তারপর হাত ও চিঠি, সব একসঙ্গে এক পলকে গায়েব হয়ে গেল। আর ঠিক তারপরই আবার সেই মাপা তিনটে জোরালো নক করার আওয়াজ, ঠক-ঠক-ঠক, এই অসাধারণ নাটিকা শুরু হওয়ার আগে যেমনটি শুনেছি হাতঘড়ি, টর্চ আর মোবাইল ফোন গায়েব হয়ে যাওয়ার পর। নক করার আওয়াজ যখন বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে,অনুভব করা যায় এমন একটা ঝাকি খেলো পুরোটা কামরা। ঘরের দূরপ্রান্তে উঠতে দেখলাম, যেন মেঝে থেকে, ফুলকি কিংবা

গোল ফোঁটা, কিংবা আলোর বুদবুদ, নানা রঙেরসবুজ, হলুদ, আগুন লাল, গাঢ় নীল। এদিক-ওদিক যাচ্ছে, উচু-নিচু হচ্ছে, ঠিক খুদে মরীচিকার মতো, আলোর ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি, কখনো দ্রুতগতি, কখনো ধীর; প্রতিটি ফুলকি, বিন্দু বা ফোঁটা স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করছে। তারপর একটা চেয়ার রওনা হলো, নিচের বসার ঘরে যেমনটি ঘটতে দেখেছি। চোখে পড়ে এমন কিছুর সাহায্য ছাড়াই দেয়ালের কাছ থেকে সরে এসে টেবিলের উল্টোদিকে স্থির হলো ওটা হঠাৎ করে, যেন চেয়ারটার সামনে থেকে,আকৃতি জন্ম নিল-এক নারীর আকৃতি।

স্পষ্ট জ্যান্ত একটা একটি আদল, আবার একই সঙ্গে ভৌতিক একটি কাঠামো। একজন তরুণীর অবয়ব, শোকে ম্লান, তবে বিস্ময়কর সৌন্দর্যের আধার; গা থেকে ঝুলছে মূল্যবান ঢোলা শাল, সাদা ও ধোঁয়াটে; নিরাবরণ গলা, নাক বা কানে কোনো অলংকার নেই। কোমর পর্যন্ত লম্বা মাথার কালো মখমল চুল। মিহি মসলিনের ওপর জরির কাজ, সেটা দিয়ে আংশিক ঢাকা তার মাথা। গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো ব্লাউজ, আস্তিন কনুই ঢেকে রেখেছে।

তার চোখ আমার দিকে নয়, তাকিয়ে আছে দরজার দিকে: ভাব দেখে মনে হলো কী যেন শুনতে পাওয়ার চেষ্টা করছে, নজর রাখছে, অপেক্ষা করছে। ছায়ার ভেতর আবছায়া ক্রমশ আরও গা হচ্ছে, একসময় আবার আমার মনে হলো ওখানে, ঘন হত থাকা আবছায়ার চূড়ার কাছে মিটমিট করছে একজোড়া চোখ, যে চোখ দুটো স্থির হয় আছে ওই আকৃতির মধ্যে।

তারপর যেন দরজা থেকে, যদিও ওটা খোলেনি,জন্ম নিল আরেকটা আকৃতি; একই রকম পরিষ্কার,একই রকম ভৌতিক, বিদঘুটে এবং উদ্ভট; তবে এটি একটি পুরুষের প্রতিমূর্তি।

এই পুরুষ আকৃতির বেশভূষা বর্তমান যুগের নয়,যেন মনে হচ্ছে গত শতাব্দীর বা তারও আগের। নারী ও পুরুষ, দুজনের আকৃতি বলো আর পোশাক-পরিচ্ছদই বলো, এতটাই বস্তুবিহীন আর অবাস্তব যে নিজেকে আমার দৃষ্টিভ্রমের শিকার বলে মনে হলো,জানি ছুয়ে দেখার মতো কিছু নয়, হাত বাড়ালে আঙুলে হয়তো কিছুই ঠেকবে না, অথচ ওদের আকৃতির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা ভয় আর বিস্ময় মেশানো ভক্তি জাগায় মনে।

একদিকে পুরোনো আমলের মূল্যবান উর্দি, কোমরবন্ধ, শিরস্ত্রাণ,পদক আর তকমা,আরেক দিকে মড়ার মতো স্থিরতা, ভূতের মতো বাষ্পীয় কিংবা ধোঁয়াটে ভাব আমাকে বিভ্রান্ত আর দিশেহারা করে তুলল।

পুরুষের আকৃতি যেই মাত্র নারী আকৃতির দিকে এগোল, অমনি দেয়ালের কাছ থেকে সরে আসতে লাগল সেই গাঢ় ছায়া। মুহুর্তের জন্য তিনটেই অন্ধকারে মিশে গেল । ম্লান আলো যখন আবার ফিরল, দুটো ভৌতিক আকৃতি যেন ছায়াটার মুঠোয় চলে গেছে, উচু টাওয়ারের মতো ওগুলোর মাঝখানে খাড়া হয়ে আছে সেই বিচিত্র ও রহস্যময় ছায়া। নারী আকৃতির বুকের কাছে আমি রক্তের ছোপ দেখলাম; ভৌতিক পুরুষ আকৃতি ভৌতিক তলোয়ারের ওপর ভর দিয় দাঁড়িয়ে, তার দামি পরিচ্ছদ ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

গ্রাস করতে উদ্যত ছায়া অকস্মাৎ যেন গিলে ফেলল ওগুলোকে এই মাত্র ছিল, এই মাত্র নেই হয়ে গেল।তারপর আবার ফিরে এল আলোর বুদবুদ, ছুটোছুটি করছে, থামছে, ছোট হচ্ছে, বড় হচ্ছে, দৃষ্টিভ্রম ঘটানোই যেন উদ্দেশ্য।

ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরালাম।

দৃশ্যমান কোনো হাতের স্পর্শ ছাড়াই এবার খেলনাঘরের ডান দিকের দেয়াল-আলমারি খুলে যাচ্ছে। পুরোটা খুলল না, তার আগেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বয়স্ক এক নারী। তার হাতে গোল পাকানো, রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো চিঠি-সেই দুটো চিঠি, যেগুলো মুঠায় ভরে নিয়েছিল হাতটা।

বয়স্ক নারীর পেছন থেকে এবার কারও পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। কিছু শুনতে পাওয়ার আশায় ঘুরল সে। তারপর চিঠিগুলো খুলে যেন পড়তে শুরু করল। আর ঠিক তখন তার কাঁধের ওপর থেকে ছাইরঙা একটা মুখ কে উঁকি দিতে দেখলাম আমি। এই মুখ যেন অনেক দিন হলো পানিতে ডোবানো ছিল-ফোলা, চামড়া ছাড়ানো, চুল থেকে জলজ আগাছা, খুদে পাতা আর শ্যাওলা ঝুলছে। আমার চোখের সামনে আরেকটা আকৃতি জন্ম নিল। শুধু নোংরা নয়, অশোভনও। দাড়িয়ে বা বসে নয়, শুয়ে আছে, শুয়ে আছে বয়স্ক নারীর পায়ের কাছে। করুণ চেহারা, পুষ্টিহীনতার নির্মম শিকার,ক্ষুধার্ত দৃষ্ট, বিধ্বস্ত ছোট শরীর, দৃষ্টিতে রাজ্যের ভয়।

একটি শিশু। চোখ তুলে আবার যখন বয়স্ক নারীর দিকে তাকালাম, দেখলাম সে এখন আর বয়স্ক নয়, জান না কীভাবে কখন তরুণী হয়ে গেছে-জরাগ্রস্ত মুখে এখন আর কোনো রেখা বা ভাজ নেই। মেয়েটির চোখে কঠিন পাথুরে দৃষ্টি, তবু তারুণ্যে ভরপুর। তারপর সেই ছায়া ওগুলোর দিকে এগোল। তরুণী, তার পেছনের মুখ, তার পায়ের সামনে পড়ে থাকা শিশু সবই এক পলকে গ্রাস করে নিল ছায়া তার অন্ধকার দিয়ে, ঠিক আগের বারের মতো। এখন শুধু ওই ছায়া ছাড়া আর কিছু নেই ঘরে,আমার তীক্ষ্নদৃষ্টি ওটার ওপর স্থির হয়ে আছে। তারপর আবার আমি ছায়া থেকে, ছায়ার ভেতর, জন্ম নিতে দেখলাম-বৈরী, বিশ্বাসঘাতক, একজোড়া সাপের চোখ। আলোর বুদবুদ আবার হু হু করের উথলে ওঠার ভঙ্গিতে ফিরে এল; শুরু হলো বিশৃঙ্খল, অনিয়মিত অস্থিরতা, মিশে যাচ্ছ নিষ্প্রভ জোছনার সঙ্গে।

তারপর আলোর ওই. বুদবুদ বা ফোটা থেকে,ওগুলো যেন একেকটা ডিম, বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল বিকৃত ও অশুভ অশরীরী।

কেউ আমাকে বলেনি, আমার মনই গেয়ে উঠিল : ‘ওগুলো সব অতৃপ্ত আত্মা।’

ঘরের বাতাসে গিজগিজ করছে ওরা-রক্তহীন,কদর্য, ঘৃণ্য। ওগুলোর বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই, আমি শুধু তোমাদের মনে করিয়ে দিতে পারি মাইক্রোস্কোপের নিচে এক ফোঁটা পানি ধরলে তাতে যেমন অসংখ্য প্রাণকে জীবাণু গাদাগাদি করা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়-স্বচ্ছ, নামনীয়, ক্ষিপ্র,

পরস্পরকে ধাওয়া করছে, ধ্বংস করছে, গলে ফেলছে-এমন কাঠামো, খালি চোখে কখনো দেখা যায় না। ওগুলোর আকৃতির মধ্য যেমন জ্যামিতিক কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, তেমনি নড়াচড়ায়ও নেই এতটুকু শৃঙ্খলা। তাদের এলোমেলো ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে কৌতুক বা খেলারও কোনো ভাব নেই; প্রায়ই আমাকে ঘিরে ধরছে ওরা, কখনো চক্কর মারছে চারপাশে; ওদের সমাবেশ বড় হচ্ছে, কখনো নিশ্ছিদ্র মেঘ হয়ে উঠছে, বেড়ে যাচ্ছে গতি।

এভাবে একসময় আমার মাথাকে মাঝখানে রেখে চক্কর মারতে লাগল ওই ভূতগুলো, হামাগুড়ি দিচ্ছে আমার ডান হাতে-যে হাতটা নিজের অজান্তেই কখন থেকে জানি না একটা বিশেষ ভঙ্গিতে লম্বা হয়ে আছে।

যেকোনো ভূত বা অশুভ শক্তিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই বিশেষ ভঙ্গি আমি জার্মানিতে ব্যবহার হতে দেখেছি।

বার কয়েক অনুভব করলাম আমাকে স্পর্শ করা হচ্ছে, তবে ওগুলো নয়, আমাকে স্পর্শ করছে অদৃশ্য সব হাত। একবার নরম, ঠান্ডা কিছু আঙুল আমার গলা টিপে ধরল। আমি আগের মতোই সচেতন আছি, জানি ভয় পেলেই সর্বনাশ, আমার শরীরটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে ওরা।

আমি আমার সবগুলো ইন্দ্রিয়কে মাত্র একটি কাজে ব্যবহার করছি : কোনো বিরতি ছাড়া প্রচন্ড জেদি এবং প্রতিরোধী ইচছাশক্তি যেন ধরে রাখতে পারি।ছায়াটা থেকে দৃষ্টি সরালাম-আসলে দৃষ্টি সরালাম ওই আশ্চর্য সর্পনেত্র থেকে-যে চোখ এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কারণ, বেশ বুঝতে পারছি,

আমার অন্য কোথাও থেকে নয়, সাপের ওই চোখ থেকে প্রবল একটা ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ঘটছে-তীব্র, সৃজনশীল, সম্ভাব্য সব রকম শয়তানিতে ভরপুর মনের একটা জোর, যেটা আমার মনের জোরকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে।

ঘরের ম্লান পরিবেশ এখন লালচে হতে শুরু করল, আমরা যেন কোনো অগ্নিশিখার কাছাকাছি রয়েছি। খুদে আত্মাগুলো, আগুনে যেমন টিকে থাকতে দেখা যায়, খুদে শিখায় পরিণত হলো আবার একবার কেঁপে উঠল ঘর।

আবার শোনা গেল পরিষ্কার ঠক-ঠক-ঠক, তিনবার নক করার মাপা শব্দ।

আবারও অধারের ভেতর গাঢ় অন্ধকার ছায়াটা গ্রাস কর নিল সবকিছু, যেন যে অন্ধকার থেকে ওগুলো এসেছিল, ফের সেই অন্ধকারেই ফিরে গেল সব।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে, গাঢ় ছায়াটা এবার পুরোপুরি বিদায় নিল। ওটা যখন ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওই একই সময়ে মোমবাতির শিখাগুলো একটু একটু করে উজ্জ্বল হতে দেখলাম।

গোটা কামরাকে এখন অবার স্বাভাবিক, শান্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।

দরজা দুটো এখনো বন্ধ। তন্ময়ের ঘরে যাওয়ার দরজায় এখনো তালা দেওয়া। দেয়ালের কোণে, যেখানে খিচুনিতে আক্রান্ত হয়েছিল বলে সন্দেহ করেছিলাম, পড়ে রয়েছে আমার কুকুর কুজো। অভয় দিয়ে, নরম সুরে ডাকলাম ওকে।

সাড়া নেই, কুজো নড়ছে না। ওর দিকে এগোলাম।

কুজো মারা গেছে। চোখ দেখে মনে হলো, এখনো আতঙ্কিত ও, কোটর ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে জিব। চোয়ালের চারপাশে ফেনা জমেছে। তুলে হাতের ভাঁজে নিলাম ওকে, তারপর খেলনাঘরের সামনে এনে ছাোট কার্পেটের ওপর শোয়ালাম।

ছোট্ট এই পোষা প্রাণীটি আমার খুব প্রিয় ছিল।

ছিল, থাকবেও, কিন্তু আমি আর ওকে পাব না, কুজোও আমাকে আর পাবে না । মৃত্যু এমন একটা ক্ষতি, কেউ কখনো পূরণ করতে পারে না।

শুধু তীব্র শোক নয়, প্রবল অনুতাপেও দগ্ধ হলাম আমি, কুজোর মৃত্যুর জন্য দায়ী করলাম নিজেকে। এরকম একটা বিপজ্জনক জায়গায় ওকে আমি নিয়ে এলাম কেন?

বেচারা ভয় পেয়ে মারা গেছে। তারপর দেখলাম, না, কুজো ভয় পেয়ে মারা যায়নি। ওর মৃত্য স্বাভাবিক নয়, ওকে আসলে খুন করা হয়েছে। বিস্ময়ের ধাক্কা আর রাগের বন্যা বয়ে গেল আমার মধ্যে, পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিস্কার করলাম ওর ঘাড় ভেঙে ফেলা হয়েছে-আসলে কুজোর কশেরুকা মোচড়ানা হয়েছে, যতক্ষণ না ওটা ভাঙে।

কাজটা তাহলে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সারা হয়েছে? এর জন্য কি আমার মতো কোনো মানুষ দায়ী নয়? রক্ত-মাংসের একটা হাতই তো কুজোর ঘাড়

মটকোছে? অবশ্যই তাই, অন্য কোনো বিকল্প আমি মানি না। তার মানে কি পুরোটা সময় কামরার ভেতর আমার মতো কোনো মানুষের প্রতিনিধিত্ব ছিল?

এ রকম সন্দেহ করার পেছনে কারণ আছে। সেটা আমি বলতে পারি না, ব্যাখ্যা করতে পারি না। আামি শুধু ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে পারি, তোমরা পাঠকেরা যে যার মতো বুঝে নাও। আরেক বিস্ময়, আমার হাতঘড়ি আর টর্চটা ফিরে এসেছে টেবিলে, সেই একই টেবিলে, যেটা থেকে জাদুর মতো ওগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

শুধু মোবাইল ফোনটা ফেরেনি, ওটা রেখে দেওয়া হয়েছে। ঠিক ছিনতাই হওয়ার মুহূর্তে ঘড়িটা অচল হয়ে গিয়েছিল। পরে ঘড়ি মেরামত করে এমন অনেক লোককে দেখিয়েছি, কেউ তারা ওটাকে ঠিক করতে পারেনি। চলে না তা নয়, চলে, তবে কখনো ভীষণ দৌড়ায়, কখনো খোঁড়ায়; হয় সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকে, নয়তো পিছিয়ে । ওটা আর পরা যায় না।

বাকি রাত আর তেমন কিছু ঘটল না। প্রতি মুহূর্তে অধীর অপেক্ষায় থাকলাম কখন ভোর হবে। তবে হানাবাড়ি ছেড়ে আমি বেরোলাম ভোরে নয়, একটু বেলা হতে। কারণ, দিনের আলো ফোটার পর ওই কামরায় ঢুকলাম, যেখানে তন্ময় আর আমি কিছুক্ষণের জন্য আটকা পড়েছিলাম।

আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে-কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারব না-ওই কামরা থেকেই কলকাঠি নেড়ে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, চেষ্টা করা

হয়েছে আমি যাতে বিভ্রান্ত হয়ে আত্মঘাতী কোনো ভুল করে বসি। গতরাতে যে ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছি আমি, সবকিছুর মেকানিজম ছিল পাশের ওই কামরায়।

৫

ঝুল লেগে থাকা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল রোদ ঢুকছে, ঢুকলাম ওই ঘরে। মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছি, কালরাতের সেই প্রথম ভীতিকর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল, যার ধারাবাহিকতা বহুমাত্রিক ভয়াবহতা নিয়ে আমার শোয়ার ঘরে মঞ্চস্থ হয়েছে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ওই চারদেয়ালের ভেতর ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি আমি টিকতে পারলাম না।

কিছুই ঘটেনি, তবু আমাকে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলো, সিড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নামছি।

আমি নামছি, আমার আগে আগে সেই পদশব্দও নামছে। অমি থামলে ওটাও থামে, আমি গতি বাড়ালে ওটাও দ্রত এগোয়। নিচে নেমে এসে সদর দরজা খুললাম। যদিও কসম খেয়ে বলতে পারব না, তবে যেন মনে হলো পরিষ্কারই শুনতে পেলাম মৃদুকণ্ঠে কে যেন একটু হেসে উঠল।

রাস্তা ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরছি, লোকজন আমাকে দেখছে, আমিও লোকজনকে দেখছি- ভাবছি, বললেও ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না কাল রাতে আমার ওপর দিয়ে কী বয়ে গেছে। সেটা আমি আশাও করতে পারি না। এই গল্প আমাকে কেউ বললে আমি কি বিশ্বাস করতাম? করতাম না।

বাড়ি ফিরে প্রথমেই তন্ময়কে ডেকে পাঠালাম। জানা দরকার কী কারণে আমাকে একা ফেলে হানাবাড়ি থেকে পালিয়ে এল সে। বাড়ির মানুষজন আমাকে জানাল, কাল রাতে তন্ময় আমার মতোই বাড়ি ফেরেনি।তিন দিন তন্ময়ের কোনো খবর পাওয়া গেল না।

চতুর্থ দিন চট্টগ্রাম থেকে লেখা ওর চিঠি পেলাম।

লিখেছে : ‘ভাইজান, সালাম-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ইত্যাদি নেবেন। জানি আমার পাওনা হয় না, আপনিও দিতে চাইবেন বলে মনে করি না, তবু নিজগুণে যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। তবে এ কথা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি, আমি যা দেখেছি তা আপনিও যদি দেখতেন, একবার নয়, আপনি আমাকে হাজারবার মাফ করতেন। ভাইজান, মনে হচ্ছে পুরোপুরি সুস্থ হতে কয়েক বছর লেগে যাব আমার। জানি না জীবনে আর কোনো দিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কি না। কুয়েত-কাতার আমার কপালে নেই, কাজেই আর ধৈর্য ধরা সম্ভব হলো না। লোকজন ইঞ্জিন নৌকায় চড়ে সাগর পাড়ি দিয়ে অনায়াসে মালয়েশিয়ায় পৌছে যাচ্ছে শুনে আমিও ভাগ্যের

ওপর বাজি ধরে কাল ও রকম একটা নৌকায় চড়তে যাচ্ছি। ওই বাড়ি ছেড়ে বের হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারছি না,

শুধু থরথর করে কাঁপছি-বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই, ওই বাড়ি থেকে এখন আমি অনেক দূরে...'

আরেকবার মাফ-টাফ চেয়ে চিঠিটা শেষ করেছে তন্ময়, ওর ভাষা প্রায় দুর্বোধ্যই বলা যায়,সবটুকু বোঝার চেষ্টা করলাম না। আর ওই হানাবাড়িতে ভয় পাওয়া সম্পর্কে যা লিখেছে সেটাকে নেহাতই ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করি আমি। সবার অনুভব এবং গ্রহণক্ষমতা এক রকম নয়। তন্ময় প্রচণ্ড সাহসী, এ কথা মনে রেখেও ওর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার রাস্তা খোলা রাখছি আমি। ওর অভিজ্ঞতাকে চ্যালেঞ্জ করব কিংবা উড়িয়ে দেব, এ রকম বোকামি করা আমার সাজে না। আমি নিজেও তো কম কিছু দেখিনি ওই বাড়িতে। অসম্ভব নয়, আমি যা দেখেছি তারচেয়েও ভীতিকর কিছু হয়তো দেখেছে ও। দ্বিমত ওখানে নয়, দ্বিমত পোষণ করছি।

অন্যত্র-আমি পিছু হটার পক্ষে নই, আমি ওর মতো হার স্বীকার করব না। পালানো কোনো কাজের কথা হতে পারে না।

নিজের থিওরিতে আমি অটল থাকলাম। যা কিছু ঘটেছে, কোনো না কোনোভাবে তার পেছনে মানুষের হাত থাকতে বাধ্য।

সন্ধ্যাবেলা একটা ট্যাক্সি নিয়ে আবার গেলাম ভূতের গলি, বেচারা কুজোর লাশসহ ফেলে আসা আমার কিছু জিনিস নিয়ে আসতে হবে।

সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম, নিজের কাজ সারলাম, আমাকে কোনোভাবে বিরক্ত করা হলো না, কিংবা আমার সামনে তাজ্জব করার মতো কোনো ঘটনাও ঘটল না, শুধু পরিচিত একটা ব্যাপার ছাড়া-সিড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় এবং নামার সময় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমার ঠিক সামনের ধাপ থেকে উঠে আসছে।

ফেরার পথে বাড়ির মালিক জব্বার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বাসাতেই পেলাম ভদ্রলাককে।

চাবির গোছাটা ফেরত দিলাম তাঁকে, তারপর জানালাম আমার যে কৌতূহল ছিল সেটা চরিতার্থ হয়েছে। গতরাতে কী ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিতে যাব, তার আগেই ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘থাক, আমার কোনো আগ্রহ নেই।’ একটু বিস্মিত হলাম।’

সেটা লক্ষ্য করে জব্বার চৌধুরী বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না, এসব অমীমাংসিত রহস্য শুনতে আমার ভালো লাগে না। এগুলো চিরকাল ব্যাখ্যার অতীত হয়েই থেকে যায়, একটারও কোনো কিনারা হয় না।’ কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত ছিল, অন্তত আমি যে চিঠি দুটো পড়েছি ওগুলোর কথা শোনাবে তাঁকে, বর্ণনা করব আমার চোখের সামনে থেকে কীভাবে গায়েব হয়ে যেতে দেখছি, তারপর জিজ্ঞেস করব তাঁর কি ধারণা ওগুলো সেই বৃদ্ধা মহিলাকে

সম্বোধন করে লেখা, যিনি তিন সপ্তাহ আগে মারা গেছেন হানাবাড়িতে। মহিলার প্রথম জীবনের ইতিহাসে তেমন কিছু থাকলে চিঠিগুলোয় যে গুরুতর সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়েছে, তার একটা ভিত্তি তৈরি হতে পারে।

কিনারা হবেই, এমন প্রতিশ্রুতি আপনাকে আমি দিতে পারছি না,ভদ্রলোককে বললাম আমি। 'তবে আপনি সাহায্য করলে আংশিক কিনারা হতেও পারে।'

'সেটা কী রকম?' ভ্রু কোঁচকালেন জব্বার চৌধুরী। 'আমি আবার কী সাহায্য করব?'

'আগে আমার কিছু কথা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কি সাহায্য।'

'ঠিকআছে, বলুন তাহলে, শুনি।'

সব শুনে প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও, পরে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। মুখ তুলে বললেন, 'মহিলার প্রথমদিকের ইতিহাস বলতে গেলে আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, আপনাকে আগেই বলেছি, তাঁর পরিবারকে আমার পরিবার চিনত। তবে আপনার কথা শোনার পর তাঁর ব্যাপারে অস্পষ্ট কী যেন একটা মনে পড়তে চাইছে। না, সেটা কী বিষয়ে তাও জানি না। অবশ্য খোঁজখবর নেওয়া যায়। ইন্টারেস্টিং কিছু জানতে পারলে আপনাকেও জানানো যায়। কিন্তু...'

'হ্যাঁ, বলুন?'

‘কিন্তু আমরা যদি প্রচলিত কুসংস্কার সত্যি বলে ধরে নিই যে গুরুতর কোনো অপরাধ যে করে বা সেই অপরাধের যে শিকার হয়, মারা যাওয়ার পর তাদের দুজনেই অতৃপ্ত আত্মা হিসেবে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জায়গায় ফিরে আসতে পারে, তাহলে কী দাড়ায়? মহিলা মারা গেছেন এক মাসও হয়নি, কিন্ত ওই বাড়িতে ভৌতিক উপদ্রব চলছে আরও অনেক দিন আগে থেকে।’ ‘আপনি হাসছেন? জবাবে কী বলবেন, শুনি?’

‘আমার বলার কথা একটাই, আর তা হলো, এসব রহস্যের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যদি আমরা পৌছাতে পারি, দেখব এর পেছনে জীবিত কোনো মানুষের প্রতিনিধিত্ব আছে।’

‘কী! মানে? আপনার ধারণা, এর সঙ্গে কোনো ধোঁকাবাজ জড়িত? কিন্তু তার উদ্দেশ্য কী?’

‘সাধারণ অর্থে ধোঁকাবাজ নয় সে, না। আমি যদি হঠাৎ গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই, যে ঘুম থেকে আপনি আমাকে জাগাতে পারবেন না, কিন্তু ওই ঘুমের মধ্যে থেকেই আমি এমন সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারব, জেগে থাকা অবস্থায় যেসব প্রশ্নের উত্তর অতটা সত্য বা সঠিক হতো না। বলে দিতে পারব আপনার পকেটে কত টাকা আছে, কিংবা বলে দিতে পারব ওই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন-এসবকে ধোঁকাবাজি বলা চলে না, এমনকি সুপারন্যাচারাল বা অতিপ্রাকৃতও বলা চলে না। ওই হানাবাড়িতে আমি ছিলাম, নিজের অজান্তে, সম্মোহনের দ্বারা প্রভাবিত।

রক্ত-মাংসের কোনো ব্যক্তির দ্বারা দূর কোথাও থেকে আমাকে সম্মোহিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আগের কোনো ঘটনা বা সম্পর্কের মাধ্যমে আমার ওপর শক্তি ফলানোর ক্ষমতা অর্জন করেছে। হিপনোটিজম বলুন, মেসমেরিজম বলুন, এসব সম্পর্কে যা বলা হয় তা যদি সত্যি হয়, তাহলে হয়তো আপনার কথা ঠিক। আপনি তাহলে এসব থেকে এরকম একটা উপসংহারে পৌছেছেন যে এক সম্মোহনকারী জড় পদার্থের ওপর অস্বাভাবিক প্রভাব খাটিয়ে, বাতাসে শব্দ এবং দৃশ্য তৈরি করে আপনাকে এবং অন্যদেরকে ভয় দেখিয়েছে?'

কিংবা এভাবে চিন্তা করুন: ওগুলোয় বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের বোধ আর অনুভূতিকে প্রভাবিত হতে দিয়েছি আমরা? যে ব্যক্তির প্রভাব আমাদের ওপর কাজ করেছে, তার সঙ্গে আমাদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বা ছিল না। উহু, সাধারণভাবে মেসমেরিজম বা সম্মোহন বলতে যা বুঝি, ওগুলোর সাহায্যে এসব সম্ভব বলে মনে করি না।'

'তাহলে?'

'তবে সম্মোহনের মতোই আরেকটা শক্তি আছে,সেটার মান সম্মোহনের চেয়ে অনেক উন্নত। আগেকার দিনের মানুষ তার নাম দিয়েছে-জাদু।'

'এর মধ্যে আপনি জাদু খুঁজে পাচ্ছেন?' জব্বার চৌধুরীকে বিমুঢ় দেখাল। "জাদুবিদ্যার শক্তি হয়তো এত দূর বিস্তৃত যে তা জড়বস্তুকেও নাচাতে পারে..."

“আমি বলছি না, কিন্ত তা যদি সত্যি হয়, সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছু হবে না হবে প্রকৃতির গোপন এবং বিরল একটা শক্তি, যেটা প্রকৃতির বিধিবিধানে কে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নিদিষ্ট কিছু বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দান করে এবং নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে সেই শক্তিকে অস্বাভাবিক মাত্রায় আয়ত্ত করাও সম্ভব। সে ধরনের একটা ক্ষমতা হয়তা বিস্তৃত হতে পারে এমনকি মৃত মানুষের ওপরও-অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু চিন্তা এবং স্মৃতি, মৃত ব্যক্তি যেগুলা এখনো ধরে রেখেছে, সেগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ করতে তাকে বাধ্য করতে পারে।কিন্তু...”

“তাকে মানে?”

“তাকে বলতে আমি ঠিক মৃত ব্যক্তির আত্মাকে বোঝাতে চাইছি না। কারণ, আত্মা জিনিসটা মানুষের নাগাল থেকে অনেক দূরে। বস্তুবিহীন একটা অস্তিত্ব প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব গোছের কিছু, যে কিনা মারা যাওয়ার পরও মাটি কামড়ে পড়ে আছে দুনিয়ায় জাদুকর তাকে বাধ্য করল আমাদের সামনে হাজির হতে, কিংবা আমাদের বোধ আর অনুভূতিতে ধরা দিতে।

জানি, এটা অতি প্রাচীন থিওরি, প্রায় ভুলতে বসা একটা আইডিয়া। কাজেই এ নিয়ে আমি কোনো মতামত দেব না। তবে এ কথা আমি মানতে রাজি নই যে ওই শক্তি অতিপ্রাকৃত কিছু হবে।”

“আপনার ব্যাখ্যার মধ্যে নতুন কিছু পাচ্ছি, আমার সত্যি খুব আগ্রহও হচ্ছে, কিন্তু....” বলে ইতস্তত করছেন জব্বার চৌধুরী।

ইতিমধ্যে বাড়ির ঝিকে ডেকে চা-নাশতা নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছেন তিনি।

‘কিন্তু কী, চৌধুরী সাহেব?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘কিন্তু সবটুকু ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না । সেটা হয়তো আমার অক্ষমতা...’

‘না, তা নয়; বোঝাতে না পারার দায় আমার ঘাড়েই চাপবে। ঠিক আছে, যা বোঝাতে চাইছি।সেটাকে আরও স্পষ্ট ও বোধগম্য করার জন্য একটা

এক্সপেরিমেন্টের সাহায্য নিই আমি, কেমন?’

‘ওহ, ইয়েস-তাহলে তো বেশ হয়।’

“সুইস চিকিৎসক প্যারাসেলসাস যেটাকে কঠিন নয় বলে রায় দিয়েছেন আর কিউরিঅসিটিজ অব লেটারেচার-এর লেখক যেটাকে বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন : একটা ফুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কীভাবে? আপনি ওটাকে পুড়িয়ে ফেলেছেন। তাজা থাকা অবস্থায় ওটার যে উপাদান ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে,

মিলিয়ে গেছে বাতাসে, আপনি জানেন না কোথায়; ওগুলো আর কখনো আপনি আবিষ্কার বা সংগ্রহ করতে পারবেন না।”

‘না।’ জব্বার চৌধুরী একটু তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। ‘তারপর?’

“কিন্তু আপনি পারবেন, রসায়নের সাহায্য, পোড়া ফুলের ধুলো বা ছাই থেকে, ওই ফুলের মতো প্রায় হুবহু একটা বর্ণচ্ছটা বা প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে, দেখতে হবে তাজা অবস্থায় ঠিক যেমনটি ছিল ওটা। এটা হয়তো মানুষের বেলায়ও সত্যি হতে পারে। সুগন্ধ কিংবা ফুলের উপাদানের মতো আত্মাও আপনাকে ভীষণ ফাঁকি দেয়। তাবে আপনি ওটার একটা স্পেকট্রাম, একটা ইমেজ তৈরি করতে পারেন। এবং এই ভূত, যদিও প্রচলিত কুসংস্কার হলো, যে লোক মারা গেছে তার আত্মা ধারণ করে ওটা, সত্যকার আত্মার সঙ্গে ওটাকে গুলিয়ে ফেলে বিভ্রান্তিতে ভোগার কোনো সুযোগ থাকবে না; ওটা হবে মৃত ব্যক্তির দৃশ্যমান প্রতিরূপ।’

‘ইন্টারেস্টিং। চা নিন, প্লিজ।’

‘ধন্যবাদ। আর তাই, ভূত এবং আত্মাদের নিয়ে প্রচলিত সেরা গল্পগুলো শোনার পর আমাদের যেটা সবচেয়ে বিস্মিত করে, যাদের আত্মা বলা হচ্ছে, তাদের ভেতর মানসম্মত বুদ্ধিমত্তার প্রচণ্ড অভাব। তারা নগণ্য জিনিসের জন্য আসে কিংবা কোনো কারণ ছাড়াই আসে, এলেও কথা প্রায় বলেই না, দুনিয়ার সাধারণ একজন মানুষের চেয়ে উন্নত কোনো আইডিয়াও দিতে পারে না।’

‘হুম, সত্যি পারে না ।’

‘ইংল্যান্ড-আমেরিকায় বহু মানুষের একমাত্র কাজ আত্মা খুজে বেড়ানো। বিরল প্রতিভার অধিকারী যেসব ব্যক্তি মারা গেছেন, তাঁদের আত্মার সঙ্গে

যোগাযোগের মাধ্যমে পাওয়া কবিতা ও গদ্য ভলিউম আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শেকসপিয়ার,বেকন, আল্লাহই জানে আর কারা আছেন। ওই যোগাযোগ থেকে পাওয়া সৃজনশীল রচনার সেরাগুলো পড়ে দেখা গেছে, তারা বেঁচে থাকলে এর চেয়ে অনেক অনেক ভালো কিছু লিখতেন। অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় তাঁরা যা লিখে রেখে গেছেন, তারচেয়ে এগুলো অনেক নিঁচুমানের, ধারে-কাছেও পৌছায় না।তার মানেই বোঝা গেল ওগুলো ঠিক ওদের আত্মা ছিল না, ছিল ওদের দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি, এই তো?'

"শুধু নিঁচুমানের হলেও কথা ছিল। সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয়, পৃথিবীতে প্রচলিত নয় এমন কোনো আইডিয়াও দেননি তাঁরা। দেওয়ার কথা না, আরেক জগতে চলে যাওয়ার পর? আরেক জগৎ-স্বর্গ, নরক কিংবা দুটোর মাঝখানে একটা জায়গা, ডাক্তার কান্তিক?"

'সুতরাং এ ধরনের ঘটনা যতই চমকপ্রদ হোক সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি, দৃষ্টি দিচ্ছি দর্শন সম্ভাব্য যে প্রশ্নটা তুলতে পারে সেটার দিকে। এটা কি অতিপ্রাকৃত, সুপারন্যাচারাল? জবাবটাও আপনার কাছ থেকে পাব বলে আশা করছি আমরা।'

'ওগুলো আইডিয়া, কোনো না কোনো ভাবে মাধ্যমটা এখনো আমরা জানতে পারিনি মরণশীল একজনের মস্তিষ্ক থেকে মরণশীল আরেকজনের মস্তিষ্কে স্থানান্তর বা প্রবাহিত করা হয়েছে। এবং সেটা করতে গিয়ে, তা সে টেবিল-

চেয়ার হাটুক বা জাদুবৃত্তের ভেতর অশুভদর্শন আকৃতি হাজির হোক, কিংবা শরীরবিহীন হাত উঁচু হয়ে নিরেট বস্তু গায়েব করে ফেলুক, অথবা অন্ধকারের ভেতর গাঢ় অন্ধকার আকৃতি পাক, আমার বেলায় যেমনটি ঘটেছে। এসব দেখে আমাদের রক্ত জমাট বাঁধার উপক্রম হয় সত্যি তারপরও, এখনো আমি জোর দিয়ে বলব, এগুলোকে অবশ্যই প্রতিনিধি বা এজেন্সির মাধ্যমে প্রবাহিত বা স্থানান্তর করা হয়--যেভাবে বৈদ্যুতিক তার বিদ্যুৎ প্রবাহে ভূমিকা রাখে-আমার নিজের মগজ থেকে অন্য একজনের মগজে। শুরু থেকেই জীবিত এবং সচেতন কাউকে দায়ী করছেন আপনি। কিছু শারীরিক কাঠামোয় প্রাকৃতিক রসায়ন আছে এবং তারা রাসায়নিক বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে-কারও ভেতর অছে প্রাকৃতিক তরল, ইচ্ছে হলে আপনি সেটাকে বিদ্যুৎও বলতে পারেন এবং তারা বৈদ্যুতিক বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে।'

'তবে, ডাক্তার কান্তিক, এসবকে আপনি স্বাভাবিক বিজ্ঞানের তালিকায় ফেলতে পারবেন না', মন্তব্য করলেন জব্বার চৌধুরী।

'না, তা ফেলছিও না', বললাম আমি। 'ওগুলোয় বস্তু বলে কিছু নেই, উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই, ছেলেমানুষির চূড়ান্ত, গুরুত্বহীন। শেষ পর্যন্ত বড় কোনো ফলাফলও বহন করে না। ফলে দুনিয়াও ওগুলোকে বিবেচনায় নেয় না, জ্ঞানী-গুণীরা মূল্য দেন না বা চর্চা করেন না। কিন্তু আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, আমি যা দেখেছি বা শুনেছি তার আয়োজক একজন মানুষ,

আমার মতো একটা বুদ্ধিমান প্রাণী এবং গোটা ব্যাপার সে পরিচালনা করেছে দূর কোথাও থেকে।'

'আপনি ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবেন বলে মনে করেন?' আরাম কেদারার কিনারায় সরে এসে আবার পিছিয়ে গেলেন জব্বার চৌধুরী। তাঁকে একটু অস্থির দেখাচ্ছে।

'আমি বিশ্বাস করি, কাজটা দূর থেকে করা হয় বলে সে নিজেও জানে না হানাবাড়িতে ঠিক কী ঘটছে বা তার প্রতিক্রিয়াই বা কার ওপর কী হচ্ছে। সে জন্যই আপনি আমাকে বলেছেন, আপনার ভাড়াটেদের অভিজ্ঞতা একজনের সঙ্গে আরেকজনের হুবহু মেলে না।'

"সত্যি তা-ই, মেলে না।"

'ভালো কথা, চিন্তা করে দেখুন, দুজন মানুষ কখনো হুবহু একই স্বপ্ন দেখে না। আমাদের এই ব্যাপারটা যদি সাধারণ ধোকাবাজি হতো, তাহলে নানা রকম মেশিনারির সাহায্য এমন ব্যবস্থা করা হতো যে ফলাফলে কোনো পার্থক্য প্রায় থাকতই না। আর, সত্যি যদি সৃষ্টিকর্তার অনুমতি পাওয়া অতিপ্রাকৃত কোনো প্রতিনিধি এর সঙ্গে জড়িত থাকত, তাহলে এটার চুড়ান্ত পরিণতি এবং সমাপ্তিও থাকত। কিন্তু আমরা শুধু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখছি, তাই না?'

কথা না বলে জব্বার চৌধুরী শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

সাধারণ ধোঁকাবাজি কিংবা অতিপ্রাকৃত, দুটোর কোনোটার মধ্যেই পড়ে না এটা। আমার দৃষ্টিতে,এখন অনেক দূরে আছে এমন কোনো মগজে এসব গজিয়েছে; যা কিছু ঘটছে সেগুলোর সঙ্গে ওই মগজের সংকল্পশক্তির সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা নেই; যা কিছু ঘটছে তাতে তার চাতুর্য, ভাঁড়ামি, চারিত্রিক অস্থিরতা এবং অর্ধসমাপ্ত চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে;

সংক্ষেপে, অন্য কিছু নয়, স্রেফ ও রকম একটা মগজের স্বপ্নগুলাকে সচল করা হয়েছে, তাতে আংশিক নিরেট কিছু পদার্থ ভরে দিয়ে। আমার আরও বিশ্বাস, এই মগজের ক্ষমতা বিপুল, সেটা জড়বস্তুকে গতি দিতে পারে, ভয়ানক অশুভ ও ক্ষতিকর এবং বিধ্বংসী শক্তির অধিকারী।'

'সে ক্ষেত্রে আপনাকে ভাগ্যবানই বলতে হবে যে...'

আমার বিশ্বাস, বায়বীয় কিছু নয়, নিশ্চয়ই নিরেট এবং জাগতিক কোনো শক্তি আমার কুকুরকে খুন করেছে। শুধু তা-ই নয়, আমিও যদি কুজোর মতো সাহস দেখাতে ব্যর্থ হতাম, আমাকেও খুন করত ওই শক্তি। কুজো ভয় পেয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে।আর আমি একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের বোধবুদ্ধি অটুট রাখতে পেরেছি, ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল হতে দিইনি । এ ব্যাপারে দুজনের কাছে কৃতজ্ঞ আমি, যাদের কাছ থেকে এ রকম শক্ত মনোবল ধরে রাখতে সাহায্য পেয়েছি। একজন আমার বন্ধু নন্দন বসাক, তিনি আপনার একজন ভাড়াটেও ছিলেন; অপরজন ফরাসি লেখক, নাট্যকার ও কবি ভলতেয়ার।'

'আপনার কুকুরকে খুন করেছে! কী বলছেন? আমার তো মনেই ছিল না! জানেন, ওই বাড়িতে কোনো পশু টিকতে পারে না, একটা বিড়াল পর্যন্ত নয়। ইঁদুর, ছুঁচো কখনো কিছু পাওয়া গেছে বলে শুনিনি।

'যা কিছু নিজের অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক প্রভাব বিস্তার করে, মানবেতর প্রাণীর ইনসটিংকট সেগুলোকে খুব সহজেই শনাক্ত করতে পারে। এ ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি অতটা সুক্ষ্ম না হওয়ার কারণ হলো, তার প্রতিরোধক্ষমতা অনেক বেশি।'

জব্বার চৌধুরীর দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ হলো। 'সেটা ঠিক আছে, বুঝলাম, কিন্তু আমার ভাড়াটে নন্দন বসাক আর ভলতয়ারের ব্যাপারটা তো বুঝলাম না, ডাক্তার কান্তিক।'

'শুনুন, একটা হানাবাড়িতে রাত কাটানো ছেলেখেলা ব্যাপার না। কোনো না কোনো মন্ত্র আপনাকে জপতেই হবে, তা না হলে ক্ষতিকর প্রভাব

থেকে নিজেকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন না। কাজেই অমাকেও একটা মন্ত্র জপতে হয়েছে।'

'কী সেই মন্ত্র, আমাকে বলা যায়?'

'হ্যাঁ, খুব বলা যায়।' ভলতেয়ারের একটা উদ্ধৃতি,বন্ধু নন্দনের মুখে শুনেছি- "It is vain for the coward to flee; death follows close behind; it is only by defying it that the brave escape"

“ওহ, দারুণ! আমি পুরো একমত।”

ভদ্রলোকের প্রশংসায় খুশি হয়ে বললাম,’এই মুহূর্তে আরেকটা মনে পড়ে যাচ্ছে, তবে প্রাসঙ্গিক কি না জানি না।’

‘বলুন, বলুন, এসবে আমি খুব মজা পাই।’

‘এও আমি নন্দনের মুখে শুনেছি “We never live; we are always in the expectation of living”

“বাঁচি না, সব সময় বাঁচার প্রত্যাশায় থাকি? কী দারুণ, কী দারুণ!”

‘তবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথেষ্ট হয়েছে, এবার বলুন, আমার থিওরিটা ‘আপনি বুঝতে পরেছেন কি না?’

‘বুঝলেও, সবটুকু বোধহয় নয়। তবে যতই উদ্ভট হোক, কোনো কিছু উড়িয়ে দেওয়া আমার স্বভাব নয় আসল কথা হলো, ঘরের ভেতর যারা ভূত আর বিদেহী আত্মা পালে, আমি তাদের দলের কেউ না। দূর্ভাগ্য হলো, আমার ওই বাড়িতে সেরকম কিছুই ঘটানো হচ্ছে বল প্রমাণ পাচ্ছি। এখন আপনি আমাকে একটা বুদ্ধি দিন, ওই বাড়ি নিয়ে আমি কী করব।’

‘আপনার জায়গায় আমি হলে কী করতাম, সেটাই বরং বলি। আমার অন্তরের উপলব্ধি হলো, দোতলার ল্যান্ডিংয়ের ছোট যে ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই আমি যে কামরায় রাত কাটিয়েছি তার ডান দিকের ঘরটার কথা বলছি-হয় ওটাই সবকিছুর শুরুর জায়গা, নয়তো ওখানেই আশ্রয়-প্রশ্রয়

দেওয়া হয় সেই অশুভ প্রভাবকে, যে প্রভাব আপনার বাড়িটাকে হানাবাড়িতে পরিণত করেছে। বাড়িটা আমার হলে ও কামরার দেয়ালগুলা আমি ভেঙে ফেলতাম, সরিয়ে ফেলতাম মেঝে-উহু, গোটা ঘরটাই ভেঙে ফেলতাম।

আমি লক্ষ করেছি, মূল বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন ওটা, ছোট একটা উঠানের ওপর তৈরি করা হয়েছে, দালানের বাকি অংশের কোনো ক্ষতি না করে ওটাকে সরিয়ে ফেলা যায়।'

'আপনার ধারণা, তা যদি করি আমি, তাহলে...'

'তাহলে বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে-কারও জাদু বা টেলিপ্যাথি কিছুই তখন আর কাজে লাগবে না। একটা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী। আমার ধারণা যে ঠিক, আমি চাই এটা প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই, আপনি যদি বলেন তো আমিও লেবার লাগিয়ে কাজটা করতে পারি, খরচটা না হয় আমারই হলো...'

'না, না,' হেসে উঠে বললেন জব্বার চৌধুরী।

'খরচ কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে, তাই করে দেখি তাহলে। আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বর তো আমার কাছে আছেই, সময়মতো যোগাযোগ করব আমি।'

৬

প্রায় দিন দশেক পর ফোন নয়, কুরিয়ার সার্ভিস জব্বার সাহেবের একটা চিঠি দিয়ে গেল আমাকে। বেশ অনেক পাতা নিয়ে বড়সড় চিঠি।

তাতে এক এক করে অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

হানাবাড়িতে নিজেই গিয়েছিলেন জব্বার চৌধুরী। আমি যে চিঠি দুটোর বর্ণনা দিয়েছিলাম তাঁকে,শরীরবিহীন শুধু একটা হাত টেবিল থেকে তুলে নিয়ে স্রেফ গায়েব হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো দেরাজে খুঁজে পেয়েছেন তিনি, যে দেরাজ থেকে ওগুলো বের করেছিলাম আমি।

আমার মতোই অনিশ্চিত ভাব নিয়ে চিঠি দুটো পড়েছেন জব্বার চৌধুরী। পড়ার পর সেই বৃদ্ধা মহিলা সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজখবর নিয়েছেন, চিঠি দুটো যাকে লেখা হয়েছে বলে নির্ভুল আন্দাজ করেছিলাম আমি।

তদন্ত করে যতটুকু জানা গেছে, এখন থেকে ঠিক একচল্লিশ বছর আগে, ১৯৭০ সালে চিঠিতে যে তারিখ লেখা আছে তার এক বছর আগে, অভিভাবকের নিষেধ অমান্য করে অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্রের উর্দুভাষী এক লোককে বিয়ে করেন এই মহিলা। সন্দেহ করা হতো লোকটা পশ্চিম পাকিস্তানি বোম্বেটে, অর্থাৎ জলদস্যু, ছোট জাহাজ ভাড়া করে আরব সাগরে ডাকাতি করে বেড়াত।

মহিলা স্বল্প শিক্ষিত এবং সচ্ছল পরিবারের সদস্য ছিলেন, তবে কম বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে প্রায় একাই তাকে বড় হতে হয়।

বিয়ের আগে একটা নার্সিং স্কুলে ট্রেনিং নিচ্ছিলেন তিনি। ধনী এক ভাই ছিল তার, বয়সে বড়। সবার ধারণা ছিল ভদ্রলোক বিরাট ধনী। স্ত্রী মারা যাওয়ায় একমাত্র সন্তান ছয় বছর বয়সী এক ছেলেকে একাই মানুষ করছিলেন।

মহিলার সঙ্গে উর্দুভাষী লোকটার বিয়ে হওয়ার এক মাস পর ভাইয়ের লাশ পাওয়া গেল বুড়িগঙ্গায়, মিল ব্যারাকের কাছাকাছি। লাশের গায়ে, বিশেষ করে গলায়, আঘাতের চিহ্ন ছিল, কিন্তু সেসব অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে না হওয়ায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয় পানিতে ডুবে,শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

উর্দুভাষী জলদস্যু আর মহিলা বাচ্চাটির দায়িত্ব নিলেন। আর কোনো নিকট আত্মীয় ছিল না, তাই ভাই তাঁর একমাত্র বোনকে নিজ সয়-সম্পত্তি দেখাশোনার অধিকার লিখিতভাবে দিয়ে রেখেছিলেন মারা যাওয়ার বেশ কিছুদিন আগেই।

বাবা পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার পর ছয় মাসও কাটল না, বাচ্চা ছেলেটিও মারা গেল। তখন শোনা গেছে, তার প্রতি কারও কোনো যত্ন ছিল না, প্রচণ্ড অবহেলা করা হয়েছে, শাসনেরও কোনো সীমা মানা হয়নি। প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, প্রায় রাতেই ছেলেটির চিৎকার আর কান্না শুনেছে তারা।

মারা যাওয়ার পর পুলিশ বিভাগের যে সার্জেন বাচ্চাটিকে পরীক্ষা করেন, তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : ‘অসম্ভব রোগা, অবশ্যই পুষ্টিহীনতার শিকার; তা ছাড়া, সারা শরীরে তাজা ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে।’

যত দূর জানা যায় কনকনে শীতের এক রাতে বাচ্চাটি বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করে। উঠানে বেরিয়ে পাঁচিল টপকাতে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তিতে কুলায়নি, ওটার মাথা থেকে নিচে পড়ে যায়। পরদিন সকালে লোকজন আধমরা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মারা যায় সে।

নিষ্ঠুরতার কিছু কিছু প্রমাণ থাকলেও, হত্যার সপক্ষে কিছু পাওয়া যায়নি; তা ছাড়া ফুফু আর তাঁর স্বামী সামান্য শাসন বা মারধরের কথা স্বীকার করে উল্টো অভিযোগ তুলে বলেছিল, ছেলেটা প্রচন্ড জেদি আর বেয়াদব ছিল।

প্রতিবেশীরাও নাকি জানত যে বাচ্চাটির মধ্যে খানিকটা পাগলামির ভাব আছে। সে যা-ই হোক, শিশুটি মারা যাওয়ায় তার সমস্ত সয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল ওই মহিলা, অর্থাৎ তার ফুফু। বিয়ের পর এক বছরও কাটল না, হঠাৎ করে মহিলার বোম্বেটে স্বামী নগদ টাকা-পয়সা নিয়ে ঢাকা ছেড়ে গায়েব হয়ে গেল সেই যে গেল, তারপর আর ফেরেনি।

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলার সময় গুজব শোনা গিয়েছিল একটা স্টিমার ভাড়া করে উপকূল এলাকায় ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল শান্তি কমিটির একদল সদস্য,তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ওই উর্দুভাষী লোকটা, মুক্তিযোদ্ধাদের একটা

দল ধাওয়া করে স্টিমারটাকে ডুবিয়ে দেয়। শোনা গেছে কেউ যাতে সাঁতরে তীরে উঠতে না পারে তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মহিলা প্রচুর সয়-সম্পত্তি নিয়ে একা বেশ সুখে ছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই সুখ বেশ দিন টেকেনি; নানা ধারাবাহিক দুর্বিপাকে পড়েন তিনি, বিশেষ করে একটা ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় এবং একের পর এক পাঁচ-সাতটা ছোটখাটো ব্যবসায় মার খাওয়ায় তাঁর আর্থিক অবস্থা আর ভালো থাকেনি। একপর্যায়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন, বাধ্য হয়ে চাকরি নেন।

বয়স, তার ওপর ছোটখাটো রোগ-শোক, চাকরিতেও বেশি দিন লেগে থাকত পারতেন না। নিঁচু থেকে আরও নিঁচুতে নেমে যেতে হয় তাঁকে। একসময় বাড়িতে বাড়িতে ঝিয়ের কাজও করতে হয়েছে। কোথাও খুব বেশি দিন টিকতে পারতেন না মহিলা। অথচ তাঁর চরিত্রে খারাপ তেমন কিছু দেখেনি কেউ; সৎ, শান্ত এবং নিজের একটা ঢংয়ে চুপচাপ প্রকৃতির ছিলেন।

তবে নিয়তি সব সময় তাঁর বিরোধিতা করেছে, তাঁর বেলায় কখনাই কিছু ইতিবাচক ছিল না। শেষদিকে একটা বিড়ি তৈরির কারখানায় কাজ নিয়েছিলেন, ওখান থেকে তাঁকে ডেকে এনে ভূতের গলির ওই হানাবাড়ি দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন জব্বার চৌধুরী, যে বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন তিনি তাঁর বিয়ের প্রথম বছর ।

জব্বার চৌধুরী তাঁর হানাবাড়ি প্রসঙ্গেও লিখেছেন। সেই খালি কামরায়, যে কামরাটা আমি তাঁকে ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিয়েছি, একা তিনি একঘণ্টা

কাটিয়েছেন। যদিও ওখানে তিনি কিছু দেখেননি বা শোনেনওনি, তারপরও প্রতি মুহর্তে অশরীরী কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করে ভয়ে প্রায় অধমরা হয়ে পড়েছিলেন ।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার কথামতো ঘরটা ভেঙে ফেলতে অস্থির করে তোলে তাঁকে। লেবার লাগিয়ে কাজটা তিনি করিয়েছেনও। সবকিছু জানিয়ে আমাকে এই চিঠি লেখার আরেকটা কারণ, আমি যেন একবার গিয়ে দেখি আসি ভাঙাটা কী রকম হয়েছে। চিঠির শেষদিকে জব্বার সাহেব আমাক যেন বলতে চেয়েছেন, ওখানে আমার জন্য সম্ভবত একটা চমক অপেক্ষা করছে।

ফোনে যোগাযোগ করে দিনক্ষণ ঠিক করলাম।

তারপর আবার হাজির হলাম হানাবাড়িতে। ওখানে দুই তরুণ ভাগনেকে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন জব্বার চৌধুরী।

ইট-সুরকির স্তুপকে পাশ কাটিয়ে, তুলে ফেলা কাঠের মেঝের পাশে গিয়ে দাড়ালাম। আমাকে জানানো হলো, কাঠের পাটাতন তোলার পর নিচে

একটা চোরা-কুঠরির দরজা পাওয়া গেছে। দরজার কবাট লোহার পাত আর পেরেক দিয়ে বন্ধ করা।

‘আমি বললাম, 'কোথায়, দেখি তো!’

জব্বার চৌধুরীর নির্দেশে তাঁর তরুণ ভাগনেরা কাঠের আলগা পাটাতন একপাশে সরিয়ে রাখল। সত্যি জানালা আকৃতির ছোট একটা দরজা দেখতে পেলাম, ফুটোঅলা লোহার পাত দিয়ে আটকানো। এক এক করে প্রতিটি ফুটোর পেরেক তুলে দরজার কবাট খোলা হলো।

ঘুণাক্ষরেও যা কেউ সন্দেহ করেনি, কবাট খোলার পর কয়েকটা ধাপ দেখা গেল, নিচে একটা কামরা।

ভাগনেদের সতর্ক পাহারায় থাকত বললেন জব্বার চৌধুরী, তারপর আমাকে বললেন, 'আপনি একা নামবেন না, আমাকও সঙ্গে নিন।'

'আপনি বরং আমাকে সঙ্গে নিন', বললাম আমি।

ধাপ বেয়ে নামছি আমরা, জব্বার চৌধুরী আগে,তাঁর পিছু নিয়ে আমি। একসময় এই কামরায় জানালা এবং বাতাস চলাচলের জন্য ভেন্টিলেটার ছিল, তবে দুটোই পাকা গাথুনি দিয়ে বন্ধ, বোঝাই যাচ্ছে বহু বছর আগে থেকে। কী আছে না আছে মোম জ্বেলে দেখতে হচ্ছে।

প্রাচীন কিছু আসবাবপত্র দেখতে পাচ্ছি- তিনটে চেয়ার, একটা টেবিল,একটা দেয়াল-আলমারি; সবই খুব পুরানো, ১০০ বছরের বেশি হবে তো কম নয়।

আলমারিতে পেলাম দেশীয় কোনো ছোটখাটো রাজার প্রভাবশালী অমাত্য কিংবা পদস্থ কোনো কর্মচারীর বেশভূষায় লাগতে পারে এমন সব খুঁটিনাটি

জিনিস কোমরবন্ধ, পদক, তকমা, আলখেল্লা, কুর্তা, আচকান, মোজা, জুতো, বর্ম, পরচুলা, শিরস্ত্রাণ, তলোয়ার ইত্যাদি। পুরোনো যে কোটটা পেলাম তাতে

একসময় নিশ্চয়ই সোনার বোতাম লাগানো ছিল, কারণ বাইশটা ঘর থাকলেও, সেগুলোয় ঢোকানোর জন্য বোতাম নেই একটিও। তিনটে স্বর্নমুদ্রা পেলাম, সম্রাট আকবরের আমলে তৈরি; রানি এলিজাবেথের অবয়বসহ কিছু রৌপ্যমুদ্রাও রয়েছে। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটা আমন্ত্রণলিপি পেলাম, রাজকীয় কোনো উৎসবে যোগ দেওয়ার টিকিট। তবে আমাদের মূল আগ্রহ কেড়ে নিল লোহার সিন্দুকটা। কামরার এক কোণে দেখা যাচ্ছে ওটাকে, দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা। সিন্দুকের তালা যখন কোনোভাবেই খোলার ব্যবস্থা করা গেল না, বাধ্য হয়ে শাবলের চাড় দিয়ে সিন্দুকের গা থেকে তালার পুরোটাই আমরা আলাদা করে ফেললাম।

ভেতরে তিনটে তাক আর দুটো ছোট দেরাজ রয়েছে। তাকগুলোয় স্ফটিকের তৈরি ছোট আকারের কিছু বোতল ও শিশি দেখতে পেলাম, এমন আঁটো করে বন্ধ যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে।

ওগুলোর ভেতর এক ধরনের রংবিহীন চঞ্চল নির্যাস রয়েছে চঞ্চল বলার কারণ, বাতাসের সংস্পর্শে আসা মাত্র বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবে ওটা। এই তরল সম্পর্কে আমি বেশ কিছু বলতে চাই না, শুধু জানিয়ে রাখি জিনিসটা বিষাক্ত নয়, ওগুলোর কোনো কোনোটায় ফসফার এবং অ্যাম্যোনিয়া মেশানো হয়েছে।তাকগুলোয় কৌতূহল জাগানার মতো কাচের তৈরি বেশ কিছু

টিউবও দেখতে পেলাম। আরও রয়েছে লোহার চোখা ছোট রড, বেশ বড় পাথুরে স্ফটিকের টুকরো এবং উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও হলুদ ফসিল রজনের ভারী একটা খন্ড।

প্রথম দেরাজে হাতে আঁকা ছোট আকৃতির একটা প্রতিকৃতি রয়েছে, সোনালি জমিনসহ বাকি রংগুলো এত দিন পরও এমন তাজা ও ঝকঝকে যে বিস্মৃত না হয়ে পারলাম না। এটি একজন পুরুষের প্রতিকৃতি, বয়স আন্দাজ করলাম সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ,তার বেশি নয়।

ওই ব্যক্তির মুখটা সত্যি বড় অদ্ভূত, একবার দেখলে জীবনে কেউ ভুলতে পারবে না। তোমাদের কল্পনায় যদি আসে তো চেষ্টা করে দেখতে পারো- প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা সরীসৃপ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে : সাপের বৈশিষ্ট্যসহ মানুষের মুখ বা মানুষের বৈশিষ্ট্যসহ সাপের মুখ। তার অবয়বের সামনের অংশ অস্বাভাবিক চওড়া আর চ্যাপ্টা, তারপর মুখের কাঠামো সরু হতে শুরু করায় ভয়ংকর চোয়ালের শক্তি আড়ালে পড়ে গেছে। আর তার মারাত্মক চোখ-আকারে ওগুলো লম্বাটে,

সেখানে শ্বাপদের ঠান্ডা দৃষ্টি, মূল্যবান রত্নের মতো চকচক করছে সবুজাভ মণি জোড়া; দৃষ্টির নিস্ক্রিয় শীতলতার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতার আভাস মেলে। বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার মতো বিষয় হলো লোকটার চেহারা দেখামাত্র আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। যতই অবিশ্বাস্য

এবং বিস্ময়কর হোক, পাক-ভারত উপমহাদেশে দুর্লভ এমন একটা প্রতিকৃতির সঙ্গে এই সুরতের প্রায় হুবহু মিল দেখতে পাচ্ছি আমি।

তাঁর পরিচয় আমি প্রকাশ করব না, আসলে তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়- করলে আমাকে জটিল আইনি সমস্যায় পড়তে হতে পারে,

কারণ ধারণা করি, এই ব্যক্তির উত্তরপুরুষরা এখনো এই আঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বংশ রক্ষা করছেন। এই কাহিনিতে আমি যা প্রকাশ করতে যাচ্ছি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় যদি এর বেশি পরিষ্কার করি, তাহলে তাঁরা হয়তো আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন না।

তোমার তাকে চিনতে পারবে বলে মনে করি না, তবে নাম বলা হলে তোমাদের গুরুজনেরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন, বিশেষ করে এই এলাকার আড়াই-তিন শ বছরের পুরোনো ইতিহাস যদি খুঁটিয়ে পড়া থাকে। তোমরা ধরে নাও ইনি ছোটখাটো রাজা কিংবা বড়সড় জমিদার অথবা মাঝারি মানের একজন নবাব নন, এসবের চেয়ে এক ধাপ নিচের একটা পদে ছিলেন। এই ব্যক্তি নিজের যুগে বিচিত্র সব কান্ড ঘটিয়ে তুমুল শোরগোল তুলেছেন। ইতিহাস তাঁর সম্পর্কে খুব সামান্য বলে কিংবা কিছুই বলে না: কিন্তু যারা তাঁর সমসাময়িক ছিলেন, তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গেলে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান, অপরিণামদর্শী কীর্তিকলাপ, প্রচন্ড অহমিকা, বেপরোয়া মনোভাব এবং অতিপ্রাকৃত তথা গূঢ় ঐন্দ্রজালিক বিজ্ঞান নিয়ে অদম্য আগ্রহ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়।

পুরো ডানা মেলে জীবন যখন পরিপূর্ণতা পেতে চলেছে ঠিক তখন প্রাণত্যাগ করেন তিনি এবং যথাবিহিত তাঁকে কবর দেওয়া হয়, অন্তত ইতিহাস সেরকমই বলে- স্বদেশে নয়, বিদেশবিভূঁইয়ে। আইনের নাগাল থেকে পালানোর সময় মৃত্যু হয় তার, কারণ তিনি যে অপরাধ করেছিলেন তাতে ধরা পড়লে অবশ্যই জল্লাদের হাত তুলে দেওয়া হতো তাকে।

মৃত্যুর পর, তাঁর সবগুলো প্রতিকৃতি এক জায়গায় জড়ো করে ধ্বংস করা হয়েছিল। দু-চারটে নয়,অসংখ্য প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছিল তখন; এর কারণ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল, উদারচিত্তে চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই ধ্বংসকাণ্ডের আয়োজন করেন তারই স্বজনেরা, সম্ভব হলে যারা নিজেদের বংশধারা থেকে ওই ব্যক্তির নাম চিরতরে মুছে ফেলতে পারলে খুশি হতেন।

বিপুল সম্পদ ভোগ করে গেছেন এই ব্যক্তি। তবে তাঁর বেশির ভাগ সম্পদই অপচয় হয়েছে প্রিয় একজন জ্যোতিষী তথা তান্ত্রিক সাধকের দ্বারা। মোটকথা, মৃত্যুর সময় তাঁর এই বিপুল সম্পদ কোনো হিসাব বা হদিশ ছাড়াই গায়েব হয়ে যায়।

বলা হয়, মাত্র একটি প্রতিকৃতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে;

কয়েক মাস আগে দিল্লিতে একজন ভারতীয় সংগ্রাহকের গোপন ঠিকানায় সেটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দেখে সত্যি চমৎকৃত হয়েছি; শুধু একা আমি না, ওই ছবি যে দেখবে তারই এই একই অনুভূতি হবে-এমন

একটা মুখ, যা কখনো ভোলা যাবে না; এবং এই মুহূর্ত সেই মুখেরই খুদে একটা সংস্করণ ধরা রয়েছে আমার হাতে।

এটা ঠিক যে স্বাভাবিক আকারের যে প্রতিকৃতি আমি দেখেছি, তার তুলনায় বা মৃত্যুর সময় তাঁর মূল প্রতিকৃতির তুলনায় খুদে সংস্করণে তাঁর বয়স বছর কয়েক বেশি লাগছে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর কেন?

এই ডাকাবুকো অভিজাত ব্যক্তি যে সময় কুখ্যাতির চরমে পৌছেছেন আর এই খুঁদে প্রতিকৃতিটি যে সময়ে আঁকা হয়েছে বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে কম করেও ২০০ বছরের ব্যবধান।

আমি যখন ছবিটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ মনে মনে হিসাব কষছি,

এই সময় পাশ থেকে একটা বোমা ফাটালেন জব্বার চৌধুরী।

"ডাক্তার কান্তিক, এও কি সম্ভব? এই লোককে আমি চিনি।"

তাঁর দিকে তাকালাম, ভাবলাম নিশ্চয়ই শুনতে ভুল হয়েছে আমার।

'কী বললেন? আরেকবার বলুন।'

"আমি চিনি। এই লোক আমার পরিচিত।"

'কীভাবে...কবে থেকে,..কোথায়?'

'দেখেছি কানাডার কুইবেক প্রদেশে। সে অনেক বছর আগের কথা। প্রায় ৩০ বছর তো হবেই। কানাডা মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য জাঁ পল আঁরি-র

অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন ইনি, কী একটা ঝামেলা পাকিয়ে সরকারকে খেঁপিয়ে তুলেছিলেন, তাঁরি নিজেও মন্ত্রিত্ব হারাতে বসেছিলেন। এই ব্যক্তিকে একজন ভারতীয়- ফরাসি হিসেবে চিনতাম আমরা, তার নাম জুবায়ের খান মজলিশ- ভয়ানক চতুর, একগুঁয়ে, আইনকানুন মানতে চাইতেন না। উপমহাদেশের লোকজন কুইবেকে যারা তখন থাকতাম আমরা, ওই ব্যক্তি অবাঞ্চিত ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। ওই লোক আর এই লোক, এক ব্যক্তি হতে বাধ্য-একই মুখ দুজন লোকের হতে পারে না, অথচ এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে এটা প্রায় ৮০ থেকে ১০০ বছর আগে আঁকা হয়েছে।'

রোবটের মতো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওল্টালাম ওটা খুঁদে প্রতিকৃতির উল্টোপিঠ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছি পেছনে খোদাই করা পঞ্চভূজাকার একটা কবচ দেখতে পেলাম। সন্দেহ নেই জাদু বা মন্ত্রপূতই হবে; কবচের মাঝখানে একটা মই, আর সেই মইয়ের তৃতীয় ধাপে তারিখ লেখা- ১৯১১।

আমার মাথার ভেতর একটা ধাঁধা তৈরি হলো। এখানে বলা হচ্ছে, এই ছবি আঁকা হয়েছে ১৯১১ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ১০০ বছর আগে । কিন্তু এই ব্যক্তির পূর্ণদৈর্ঘ্য যে একমাত্র প্রতিকৃতিটি দিল্লিতে আমি দেখেছি, সেটা আঁকা হয়েছে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে। এটা কীভাবে সম্ভব?

ফ্রেমের পেছনটা রঙ ভালো করে পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রায় দেখা যায় না এত ছোট, কাপড় ঢাকা, একটা পুতি আবিষ্কার করলাম। পুতির ছদ্মবেশে

ওটা আসলে একটা বোতাম, নিচে স্প্রিং লাগানো আছে। চাপ দিতে খুলে গেল ছোট একটা ঢাকনি।

ঢাকনির ভেতর দিকে খোদাই করা হরফে লেখা রয়েছে, ফারসি ভাষায় : 'জাহানারা, এটা তোমার জন্য-জীবনে এবং মরণে বিশ্বস্ত থেকো মাত্র একজনের প্রতি...'

এখানে যে নামটি লেখা হয়েছে, সেটি আমি প্রকাশ করব না, তবে তা আমার অপরিচিত নয়। আমি আমার ছেলেবেলায় প্রবীণ গুরুজনদের মুখে চতুর ধোঁকাবাজ এবং জাদুকর হিসেবে এই নাম উচ্চারিত হতে শুনেছি,

যিনি কি না প্রাচীন ঢাকায় এক কি দুই বছর খুব আলোচিত ছিলেন। তারপর নিজবাড়িতে সংঘটিত জোড়া খুনের অভিযোগ মাথায় নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। খুন হন তাঁর নিজের স্ত্রী এবং নিজের এক প্রতিদ্বন্দ্বী, যিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে জব্বার চৌধুরীকে আমি কিছুই জানালাম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিকৃতিটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম।

লোহার সিন্দুকের প্রথম দেরাজ খুলতে কোনো সমস্যা না হলেও, দ্বিতীয়টা খুলতে ঘেমে নেয়ে উঠলাম আমরা চারজন-কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ইতিমধ্যে জব্বার চৌধুরীর ভাগনেরাও চোরা-কুঠরিতে নেমে এসেছে।

তালা দেওয়া নয়, অথচ দেরাজটা খোলা যাচ্ছে না, জানা কথা জং ধরে আটকে হয়ে গেছে।

অগত্যা সরু ফাটলে ছেনির কিনারা ঢুকিয়ে চাড় দিতে হলো।

একটু পরেই খুলল শেষ দেরাজ। ভেতরে আশ্চর্য নিখুঁত করে সাজানো জিনিসটা দেখে সবাই আমার যারপরনাই বিস্মিত হলাম। বেশ শক্ত ও সরু একটা বই, তার ওপর স্ফটিকের তৈরি একটা পেয়ালা, আর ওই পেয়ালায় পরিষ্কার তরল পদার্থ দেখতে পাচ্ছি-ওই তরলে ভাসছে হাতে তৈরি এক ধরনের কম্পাস, নিঃসঙ্গ একটা কাঁটা বারবার ঘুরে দিক পরিবর্তন করছে।

কিন্তু কম্পাসে যেমন সাধারণ দাগ টানা থাকে,এখানে তার বদলে রয়েছে সাতটা আশ্চর্য চিহ্ন- জ্যোতিষশাস্ত্র যে ধরনের চিহ্ন গ্রহ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর চেয়ে খুব একটা আলাদা নয়।

অদ্ভূত একটা গন্ধ বেরোচ্ছে দেরাজটা থেকে, তবে তা খুব কড়া বা অপ্রীতিকর নয়। ওটা এক ধরনের ঝাড়গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি, যে গাছে খাওয়ার যোগ্য লালচে-বাদামি রঙের বাদাম ফলে। গন্ধের কারণ যা-ই হোক, স্নায়ুতে তার একটা প্রভাব পড়ে। আমরা সবাই সেটা অনুভব করছি, আঙুলের মাথা থেকে শুরু করে চুলের গোড়া পর্যন্ত শিরশির করছে; ঘন ঘন নাক সিটকাচ্ছে জব্বার সাহেবের ভাগনেরা। পরীক্ষা করে দেখার প্রবল আগ্রহে বইয়ের ওপর থেকে পেয়ালাটা তুলে নিলাম। নিঃসঙ্গ কাটার চক্কর মারার গতি অকস্মাৎ বহুগুণ বেড়ে গেল, তারই সঙ্গে আমার শরীরের গোটা

কাঠামো বিরতিহীন ঝাঁকি খেলো, কিছু বুঝতে পারার আগেই হাত থেকে খসে মেঝেতে পড়ে গেল পেয়ালাটা। তরল পদার্থ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল পেয়ালা, কম্পাসটা গড়িয়ে কামরার শেষ মাথায় গিয়ে ঠেকল। কম্পাস স্থির হওয়া মাত্র কামরার সবগুলো দেয়াল আগু পিছু দুলতে শুরু করল, যেন দৈত্যাকার কোনো হাত ওগুলোকে ধরে ঝাকাচ্ছে। জব্বার চৌধুরীর দুই ভাগনে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে ভেবে এত ভয় পেল যে আমাদের ফেলেই কামরা ছেড়ে পালিয়ে গল। আমরাও ওদের পিছু নিয়েছি, তবে কম্পনটা ধীরে ধীরে কমে আসছে দেখে ধাপ বেয়ে নেমে এলাম আবার।

নতুন আর কিছু ঘটছে না বুঝতে পেরে ওরা দুজনও ফিরে এল।

ইতিমধ্যে বইটা আমি খুলেছি। সাধারণ লাল চামড়া দিয়ে মোড়া ওটা, রূপোর আংটা দিয়ে আটকানো। ভেতরে চওড়া এক প্রস্থ ছাগলের চামড়া, তাতে কিছু লেখা আর ছবি দেখা যাচ্ছে। মাথার কাছে পাঁচটি সরলরেখার সাহায্যে আটকানো আলাদা দুটো ক্ষেত্র, অর্থাৎ একজোড়া পেন্টাগন বা পঞ্চভূজ আঁকা। তার নিচে, চামড়ার ডান দিকে, চারটে অগ্নিকুন্ড; ওগুলোর মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে- এই পঞ্চ অগ্নির মধ্যে বসে আছেন গভীর ধ্যানে মগ্ন একজন জটাধারী যোগী। আরেক পাশে শশক, শল্লকী, গোধা,গণ্ডার আর কূর্ম-পায়ে পাঁচটা করে নখ আছে এমন পশুদের ছবি, আঁকা নাকি সুক্ষ্ম রেশম দিয়ে বোনা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সংস্কৃত এবং ফারসি, লেখাটা দুই ভাষায়; তরজমা করলে এ রকম অর্থ দাড়ায় ;

‘এই দেয়ালগুলোর ভেতর যা কিছু অথবা যে কেউ যখনই প্রবেশ করতে পারুক- তা অনুভবক্ষম হোক কিংবা জড়, জীবিত হোক কিংবা মৃত কাঁটা যেমন নড়বে, তেমনি কাজ করবে আমার ইচ্ছাশক্তি! বাড়িটা অভিশপ্ত হোক আর এর বাসিন্দারা অস্থিরতায় ভুগুক।’

আর কিছু পাইনি আমরা। জব্বার চৌধুরী প্রাচীন বইটা, বাণীবদ্ধ অভিশাপসহ পুড়িয়ে ফেললেন। ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হলো চোরা-কুঠরি। লেবারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাড়ির ওই অংশের ভিত পর্যন্ত যেন তুলে ফেলা হয়।

তারপর অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয় জব্বার চৌধুরী নিজে ওই হানাবাড়িতে পুরো এক মাস কাটালেন। কী অভিজ্ঞতা হলো, সেটা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক।

‘প্রথম কদিন দু-চারটে ধেড়ে ইঁদুর আর নাদুসনুদুস একটা কালো বিড়াল একটু বিরক্ত করেছে। অথচ এ বাড়িতে এর আগে এসব প্রাণী কেউ দেখেনি। ওগুলো ছাড়া একদিনও আমি আর কিছু দেখিনি বা কিছু শুনিনি। পাঁচ-সাত দিন পর ইদুর মারার জন্য মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে বিষ দেওয়া হয়, সেই থেকে ইঁদুরের উপদ্রবও থেমে গেল। তবে দুঃখ পেয়েছি বিড়ালটা মারা যাওয়ায়। ওটা বোধহয় ভুল করে বিষ মেশানো কয়েক টুকরো মাংস খেয়ে

ফেলেছিল, কিংবা কে জানে হয়তো মরা ইদুরই খেয়ে ফেলেছিল। যা-ই হোক, বাড়িটা আবার ভাড়া দেওয়া হয়েছে। নতুন ভাড়াটেরা এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করেনি।'

কিন্তু আমার গল্প এখনো শেষ হয়নি।

৭

হানাবাড়ি থেকে বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছেন জব্বার চৌধুরী, নতুন ভাড়াটের খোঁজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন পত্রিকায়, এই সময় একদিন সকালের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমি।

খোলা জানালার সামনে দাড়িয়ে গল্প করছি আমরা। সাবেক হানাবাড়ি থেকে তাঁর কিছু আসবাবপত্র নিয়ে একটা কাভার্ড ভ্যান এসেছে, সদর দরজার বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছে সেটা, ভ্যানের লোকজন মাল-পত্তর নামাতে ব্যস্ত। আমি আমার নিজের থিওরিটা জব্বার চৌধুরীকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বলছিলাম, বিচিত্র এবং অবিশ্বাস যেসব ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত বলা হচ্ছিল, তার সবই আসলে জন্ম নিয়েছে কোনো মানুষের মাথা থেকে।

জাদু কিংবা অভিশাপের কথা বলেছিলাম, তার অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পেয়েছি এবং আমার যুক্তি ও আইডিয়ার সমর্থনে সেগুলো আমরা ধ্বংসও করেছি। উত্তরে জব্বার চৌধুরী বললেন, ‘সম্মোহন,জাদু- যে নামেই ডাকা হোক, এই ক্ষমতা সম্পর্কে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জাগছে। প্রশ্নগুলো জাগছে এই জন্য যে আমরা কোন যুগে বাস করছি এটা আমি ভুলতে পারছি না। স্টিফেন হকিং যেখানে...’

"কী প্রশ্ন?"

‘যিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন তাঁর অনুপস্থিতি এবং অবর্তমানেও সত্যি সেটা কাজ করবে? একে তো এ রকম অসাধারণ সব কান্ড ঘটবে, তার ওপর কান্ডগুলো ঘটতেই, থাকবে এমনকি ক্ষমতার ওই প্রয়োগকারীর মৃত্যু হওয়ার পরও?’

আমি কিছু বলতে যাব, আমাকে বাধা দিয়ে বলে যাচ্ছেন তিনি।

‘জাদু বা সম্মোহন তার কাজ শুরু করল, যেখানে শুরু হলো তার চারধারে দেয়াল তুলে জায়গাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো আজ থেকে কম করেও ১০০ বছর আগে। তাহলে এটা পরিষ্কার যে যিনি এই জাদু বা সম্মোহন ব্যবহার বা প্রয়োগ করেছেন তিনি অনেক আগেই মারা গেছেন?’

জব্বার চৌধুরী উত্তর দিচ্ছিলেন পাল্টা প্রশ্ন করে, এ সময় হঠাৎ এক হাতে খপ করে তাঁর কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরলাম আমি, আরেক হাত লম্বা করে জানালার বাইরে তার দৃষ্টি আকর্ষন করলাম।

নিচের রাস্তার ওপর তাকিয়ে আছি আমরা দুজন।

সুবেশী এক ব্যক্তি রাস্তা পার হচ্ছেন, আমাদের দৃষ্টি তাঁর ওপর আটকে আছে। রাস্তার এপারে এসে এ-বাড়ির সদর দরজার সামনে দাড়ানো

ভ্যানগাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। তাঁর মুখ পুরোপুরি জানালার দিকে ফেরানো, ফলে পুরোেটাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই মুখ আর আমাদের আবিষ্কৃত খুদে প্রতিকৃতিতে দেখা মুখ এক এবং অভিন্ন।

আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর অগে যে অভিজাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছিল, সেই প্রতিকৃতির মুখ আর রক্ত-মাংসের এই মুখ হুবহু এক।

"ও আল্লাহ রে!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন জব্বার চৌধুরী।

'ওটা শুধু ওই ছবির মুখ নয়, ওটা জুবায়ের খান মজলিশের মুখও। আমার কিশোর বয়সে যেমন দেখেছি, ৩০ বছর পর সেই একই রকম দেখছি, বয়স একটা দিনও বাড়েনি!'

'এ কীভাবে সম্ভব, ডাক্তার সাহেব?'

'একই চিন্তায় আমার মাথাও ঘুরছে, জব্বার চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তিনতলা থেকে দ্রুত সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। দরজা পার হয়ে আমিই প্রথম রাস্তায় বেরোলাম, কিন্তু ওই ব্যক্তি ততক্ষণে চলে গেছেন। তবে হন হন করে হাটতে শুরু করায় খানিক পর তাঁক আমি খুঁজে পেলাম, মাত্র কয়েক গজ সামনে, ভজহরি শাহা স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি তাঁর পাশে পৌছে গেছি। কথা বলতে যাব, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা অসম্ভব মনে হলো। ওই চোখ, তাঁর ওই সর্পনেত্র, আমার দিক তাকানোর মুহূর্তেই যেন জাদু করল আমাকে। আক্ষরিক অর্থে ওই মুহূর্তে আমি বোবা আর বোকা বনে গেলাম। শুধু তা-ই নয়, ওই ব্যক্তির মধ্যে এমন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব এবং আভিজাত্য আছে এমন

অহংকার, কর্তৃত্ব আর শ্রেষ্ঠত্বের ভাব আছে, যে কেউ তাঁর সামনে পড়ে গেলে থতমত খেতে বাধ্য।

তা ছাড়া, আমি তাঁকে কী বলব? কী জিজ্ঞেস করব?

প্রবল আগ্রহে অকস্মাৎ ভাটা পড়ায় কয়েক পা পিছিয়ে পড়লাম, তবে তারপরও তাঁর পিছু ছাড়িনি দ্বিধায় ভুগছি, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না, মনে হচ্ছে দেখা দরকার কোথায় যান তিনি, কী করেন। তারপর দেখলাম বাক ঘুরে অন্য রাস্তায় চলে গেলেন তিনি। আমিও দ্রুত বাক ঘুরলাম। ফুটপাত ঘেঁষে পার্ক করা একটা মার্সিডিজের পাশে অটল পাথুরে মুর্তির মতো দাড়িয়ে রয়েছে একজন শোফার, তাঁকে দেখামাত্র স্যালুট করল, সমীহের সঙ্গে খুলে দিল গাড়ির দরজা। একবারও পেছন দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠলেন তিনি, তাঁকে নিয়ে চলে গেল মার্সিডিজ।

কী আর করা, জব্বার সাহেবের বাড়ির দিকে ফিরছি আমি। সদর দরজার সামনে পেলাম ভদ্রলোককে, আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

‘ভ্যানগাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে’ বাড়ির ভেতর ফিরে সোফায় বসার পর আমাকে বললেন তিনি। ‘তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই ভদ্রলোক কী বলল তোমাকে?’

জবাবে ড্রাইভার জানাল, ‘কিছু না, শুধু জানতে চাইলেন এই বাড়িটার মালিক কে।’

সেদিন সন্ধ্যা। নতুন যাত্রা শুরু করা 'নেই মানা' ক্লাবে হঠাৎ হাজির হয়েছি। তরুণ-প্রবীণ সবাই সদস্য, দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে এখানে আলোচনা হয় না। কম্পিউটারে গেমস চলে, আবার টেবিলে দাবাও।

এ ওকে চা-চপ খাওয়ায়, ও একে দই কিংবা বোরহানি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়, এখানে সব সময় দু-চারজন বুদ্ধিজীবীকেও পাওয়া যাবে এমনকি যাদের তারকাখ্যাতি আছে, তাঁদের মধ্য থেকেও হঠাৎ এক-আধজন চলে আসেন ওখানে পৌছেছি দুই মিনিটও হয়নি; আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, এক রকম বন্ধুই বলা যায় ধরুন তাঁর নাম ডক্টর অনিন্দ্য, টেবিলে বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। ভদ্রলোক আর কেউ নন, আজ সকালে দেখা প্রতিকৃতির সেই মুখ-বিশিষ্টব্যক্তি; জব্বার চৌধুরী আজ থেকে ৩০ বছর আগে যাকে জুবায়ের খান মজলিশ নামে চিনতেন। আজ সকালে দেখেছি জুবায়ের তাঁর মাথার চুলে সিথি কেটেছেন, এখন দেখছি ব্যাকব্রাশ করা। আমার দৃষ্টিতে তাতে করে তার প্রতিকৃতির সঙ্গে মিলটা আরও পিলে চমকানো হয় দাঁড়িয়েছে। তবে আরও একটা জিনিস আমার চোখ পড়ল, কথা বলার সময় তাকে অতটা কঠিন, দুর্ভেদ্য কিংবা গম্ভীর মনে হলো না।

এমনকি দু-একবার হাসতেও দেখলাম তাকে, যদিও সে হাসি অতিমাত্রায় নীরব এবং খুবই ঠান্ডা । আজ সকালে তাঁর চেহারায় যে আভিজাত্য আর কর্তৃত্বের ভাব লক্ষ করেছি, তা যেন এখন এই সন্ধ্যায় আরও বেশি করে ফুটেছে, প্রাচীন কোনো রাজপুত্রের মতোই লাগছে তাঁকে-আশপাশে কী ঘটছে

না ঘটছে সে-ব্যাপারে চরম নির্লিপ্ত, অথচ সপ্রতিভ, বোঝা যায় নিজের ক্ষমতার লাগাম শক্ত করে টেনে রাখতে হচ্ছে তাঁকে।

রহস্যময় ওই আগন্তুক টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ডাক্তার অনিন্দ্যকে দেখলাম একটা পুরাতাত্ত্বিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছেন।

যে কথাটা প্রথমেই বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয়নি, সেটি হলো, তিনি

একজন পুরাতত্ত্ববিদ।

এগিয়ে গিয়ে যেই মাত্র আগন্তুকের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাকা খাওয়ার মতো একটা অনুভূতি হলা আমার। চেয়ারটা গরম নয়, ঠান্ডা। কিন্তু এতক্ষণ এটায় একজন মানুষ বসেছিল,তাই না? কাজেই সেটা গরম থাকার কথা না?

ডাক্তার অনিন্দ্য মুখ তুলে তাকালেন। আমাকে চিনতে পরে হাসিমুখে বললেন, 'এই যে, ডাক্তার কান্তিক, কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো আছি, ডক্টর অনিন্দ্য। আপনি ভালো তো?'

'জ্বি, ভালো,' হাসিমুখে বললেন ডাক্তার অনিন্দ্য।

'আপনার কাছে বোধহয় রোগ বা চিকিৎসার খবর বিশেষ পাওয়া যাবে না, তারচেয়ে বলুন ইদানীং বড় কোনো ক্রিমিনালকে ধরতে পারলেন কি না।'

‘ধরতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সফল হব কি না বলতে পারছি না-এ মস্ত বড় এক ক্রিমিনাল, ৩০০ বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।’

‘জ্বি?’ স্থির হয়ে গেলেন ডক্টর অনিন্দ্য।

‘আরে, কিছু না, এমনি ঠাট্টা করলাম।’

অনিন্দ্য জোর করে হাসলেন, আমার কৌতুক তাঁর মোটেও পছন্দ হয়নি।

‘আচ্ছা, এই মাত্র যিনি উঠে গেলেন, ভদ্রলোক কে বলুন তো?’

আমার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। ‘ওহ, ওর কথা বলছেন! খুবই জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা হয়েছিল পেট্রার একটা গুহায়।’

“পেট্রা মানে কি বর্তমান যুগের জর্দান?”

নড়েচেড়ে বসলেন অনিন্দ্য। ঠিক ধরেছেন। যিশুর জন্মেরও আগের কথা বি.সি. ৩১২ থেকে বিসি. ৬৩ পর্যন্ত ওখানকার আরব অধিবাসী নাবাতিয়ানদের রাজধানী ছিল পেট্রা, তারপর তারা রোম সাম্রাজ্যের প্রজা হয়।

গোলাপ-লাল বেলে পাথরের পাহাড়-প্রাচীর কাটা বা খোদাই করা প্রচুর সমাধি এবং পবিত্র মন্দির,সিনাগগ আর তীর্থস্থান আছে ওখানে, পৌছানোর একমাত্র উপায় সরু সরু সব দুর্গম আর বিপজ্জনক গিরিখাদ।

“পেট্রার একটা গুহায় দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে,ওখানেই প্রথম পরিচয়?’

‘হ্যাঁ, ওখানেই প্রথম পরিচয়। কিন্তু কেন বলুন তাে?’

‘না, এমনি। তা তিনি...কী...মানে...’

আমার বিশ্বাস আমাদের পুর্ব এশিয়ায় যে কজন সবজান্তা পণ্ডিত বেঁচে আছেন, তিনি তাঁদের নেতৃস্থানীয় । তবে পন্ডিত বলতে সাধারণত যা বুঝি আমরা, ওর বেলায় সেটা বুঝতে গেলে চলবে না।

ইনি বইপত্র খুব একটা পড়েন বলে মনে হয় না, জ্ঞান অর্জন করেন ধ্যান ও তপস্যার মাধ্যমে, মানে অলৌকিক সব উৎস থকে। সবার আগে যে দুটি গুণের কথা বলতে চাই, পান্ডিত্যের সঙ্গে যেগুলোর কোনাে সম্পর্কই নেই ;তার একটা হলো, প্রচন্ড শারীরিক শক্তি, আরেকটা,অবিশ্বাস্য সাহস।’

“ভারি ইন্টারেস্টিং তো।”

“ওখানে, মানে মধ্যপ্রাচ্যে আর কি, একটা দিন তাঁর সঙ্গে কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কী হয়েছিল শুনুন। ওই দুর্গম গিরিখাদে একদল সশস্ত্র কিডন্যাপারদের হাতে পড়ি আমরা, সে এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা; ভদ্রলোক যে কী বৃদ্ধি আর সাহসের সঙ্গে এবং একদম ঠান্ডা মাথায় আমাদের প্রাণ বাঁচালেন, বলে বোোঝানো যাবে না। তারপর যখন শুনলেন আমি সিরিয়াতেও যাচ্ছি, দামেস্কে কেনা নিজের বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন একদিন।

সত্যি,বিশাল গোলাপ বাগানের মাঝখানে দেখার মতো একটা বাড়ি বটে-মরুভূমির মাঝখানে প্রাসাদ বললেও ভুল হবে, স্বর্গ বানিয়ে রেখেছেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে রাজকীয় শান-শওকতের সঙ্গে বসবাস করছেন ওখানে। তবে কথাবার্তা থেকে আভাস পেলাম প্রেসিডেন্ট বাশারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছে না।'

একটু থেমে আবার শুরু করলেন ডাক্তার অনিন্দ্য। "প্রথম থকেই আমার মনে সন্দেহ জাগে, নিজেকে মধ্যপ্রাচ্যের একজন আমির বলে দাবি করলেও, সেটা বোধহয় তাঁর আসল পরিচয় নয়।"

"কেন, এ রকম মনে হওয়ার কারণ?"

"তিনি দেখলাম আমাদের বাংলার প্রাচীন ইতিহাস প্রায় সবই খুব বিস্তারিতভাবে জানেন। প্রসঙ্গ উঠলেই গড় গড় করে মুখস্থ বলে যান সব। আমি তাঁকে জিজ্ঞেসও করেছি আমাদের দেশ, দেশের পুরোনো ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, নবাবি,জমিদারি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আপনি এতকিছু জানেন কীভাবে? যতবারই জিজ্ঞেস করেছি, 'একসময় পড়াশোনা করেছি,' বলে জবাব দিয়েছেন, যেন এড়িয়ে গেছেন প্রসঙ্গটা।"

'ওর সম্পর্কে আর কী জানেন আপনি?'

"বিশাল ধনী; তবে রোজগারের সূত্র অজ্ঞাত। ভালো কথা, খুবই দক্ষ একজন হিপনোটিস্ট তিনি। তবে ওর সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই না,

কারণ এই একই কথা আমাকে কেউ বলল আমি বিশ্বাস করতাম না। আমাকে বলতে পারেন", অনুরোধ করলাম ডাক্তার অনিন্দ্যকে।

'আমি অবিশ্বাস করব না।'

'অবিশ্বাস করলেও আমার কিছু করার নেই। বলি তাহলে। ভদ্রলোক জাদুও জানেন। আমি ওকে নিজের চোখে নিস্প্রাণ বস্তু, অর্থাৎ জড়পদার্থ নড়িয়ে দিতে দেখেছি। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, জড়পদার্থ ওর নির্দেশ মানে।'

'যেমন?'

আপনি একটা ফোলানো বেলুনকে ঘরের এক কোণে ছুড়ে দিন, তিনি ওটাকে হুকুম করবেন, "আমার পায়ের কাছে এসে স্থির হও", বেলুন শূন্যে থাকতেই দিক পরিবর্তনের চেষ্টা করবে, তারপর মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খাবার ভঙ্গিতে এগোবে যতক্ষণ না ওর পায়ের সামনে পৌছে স্থির হয়। আমি আমার বিদ্যা-বুদ্ধির কসম খেয়ে বলছি, কথাটা সত্যি।

আমি ওকে এমনকি আবহাওয়াও বদলে দিতে দেখেছি, দেখেছি মেঘকে ভেঙে টুকরো করতে কিংবা এক জায়গায় জড়ো করতে- কাচের টিউব অথবা জাদুর কাঠির সাহায্যে। তবে অচেনা কারও সঙ্গে এসব নিয়ে আলাপ

করতে তিনি পছন্দ করেন না। মাত্র কদিন আগে বাংলাদেশে এসেছেন, কথায় কথায় আমাকে বলছিলেন বহু বছর পর আবার এখানে আসা হলো

ওর। তারমানে এখানে তিনি আগেও এসেছিলেন, তাই না? আমার কেন যেন মনে হয়, উনি এই অঞ্চলেরই মানুষ-এই বাংলার, এমনকি এই ঢাকারও হতে পারেন। কিন্তু এমনই রাশভারী টাইপের ব্যক্তি, জিজ্ঞেস করতে আমার সাহস হয় না। দাড়ান, ডাক্তার কান্তিক, আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, প্লিজ! আপনি বলছেন তিনি বাঙালি?'

'কী নাম ওর?'

'নাম? নামটা একটু অদ্ভুত- শেখ জামানুজ্জামান।'

ঠিক প্রশ্ন নয়, বিড়বিড় করে বললাম, 'জন্ম, পরিবার- এসব রহস্যময়।'

'আপনি জানলেন কীভাবে? এর ভেতর রহস্যই বা কেন থাকতে যাবে?'
'ব্যাখ্যা নেই এমন সব কারণে মানুষ ধনী হয় না? হয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে বিপুল সয়-সম্পত্তি পেয়েছেন। আয়েশী জীবনযাপন, নতুন বা বেআইনি কিছু নয়, হাজার হাজার ধনীর দুলাল এ রকম জীবন কাটাচ্ছে। '

'চলুন, ওর সঙ্গে আপনি নিজে কথা বলে দেখুন...'

ডাক্তার অনিন্দ্য হাত ধরে হলঘরের আরেক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

রোমাঞ্চপ্রিয় দুঃসাহসী ব্যক্তিরা সাধারণত যেমন হয়ে থাকেন, বিপজ্জনক, ভ্রমণে আনন্দ পান, শারীরিক গঠনের দিক থেকে শক্ত-সমর্থ, বুনো শক্তির অধিকারী, কথা বেশি বলেন, আচরণে ব্যগ্র ভাব থাকে, থাকে দাপট দেখানোর প্রবণতা; শেখ জামানুজ্জামান মোটেও সে রকম নন।

জামানুজ্জামানের কথা বলার ভঙ্গি শান্ত, কণ্ঠস্বর নিচু; আচরণে কঠিন সতর্কতা উপস্থিত সবাইকে আড়ষ্ট করে তুলবে এবং রীতি মেনে ভব্যতা দেখানোর প্রবণতা একটা দূরত্ব সৃষ্টি করবে- এই রীতি ও আনুষ্ঠানিকতা বর্তমান যুগে বেমানান, এককালে অভিজাতশ্রেণীর গৌরব এবং সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হলেও।

আমি লক্ষ করলাম তিনি যে বাংলা বলছেন, সেটাও পুরোপুরি এই যুগের নয়। তাঁর ভাষায় বেশ কিছু সংস্কৃত এবং ফারসি শব্দ চলে আসছে। আমি তাঁর বাচনভঙ্গি আর উচ্চারণেও বিদেশি টান পেলাম, সেটা অবশ্য পাওয়ারই কথা। মানুষ দীর্ঘকাল বিদেশে থাকলে তার নিজের আঞ্চলিক টান খুইয়ে বসতে পারে। কথায় কথায় তিনি আমাদের জানালেন, বাংলাদেশেই জন্ম তার, বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতে মেলা সময় বেরিয়ে গেছে, অনেক কাল পরে আবার এখানে তার আসা হলো, তাও এখনই ঠিক বলতে পারছেন না এবার তিনি স্বদেশে থিতু হবেন কি না। বাংলাদেশ, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা, তিনি শেষবার দেখার পর কতটুকু কী বদলেছে তা নিয়ে কথা উঠল। ডক্টর অনিন্দ্য মৌলিক বিষয় কী বদলেছে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করলেন- সাহিত্য, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, রাজনীতিতে- গত চল্লিশ বছরে

মহান যেসব প্রবীণ ব্যক্তি মঞ্চ ত্যাগ করে চলে গেছেন, অকুণ্ঠচিত্তে তাঁদের গুণকীর্তন করলেন, তরুণদল যারা আসতে যাচ্ছেন আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের স্বাগত জানালেন। দেখা গেল শেখ জামানুজ্জামান এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ পোষণ করছেন না। এত কিছু জানেন তিনি, কিন্তু বাংলাদেশের একজন কবি বা সাহিত্যিকের নাম জানেন না। জীবিত কোনো লেখকের একটা বইও পড়েননি। রাজনীতি সম্পর্কেও একই কথা, জাতীয় নেতা প্রায় কাউকেই চেনেন না, নাম পর্যন্ত শোনেননি। বোধহয় কৌতুক করার জন্যই অনিন্দ্য তাঁকে প্রশ্ন করল, 'যদি সিদ্ধান্ত নেন এবার দেশেই থেকে যাবেন সংসদে বসার ইচ্ছে হবে নাকি? টাকা থাকলে নির্বাচিত হওয়া কোনো ব্যাপার না।'

এই প্রথম হেসে উঠলেন শেখ জামান। সেটা তাঁর ভেতরের হাসি-শ্লেষাত্মক, অশুভ-আসলে একটা খেঁকানির হাসি হয়ে ওঠা মাত্র ।

মিনিট কয়েক পরে ডক্টর অনিন্দ্য জরুরি কাজের কথা বলে আমাকে ওখানে রেখেই বিদায় নিলেন।

টেবিলে যখন শুধু অমরা দুজন হয়েছি, সুযোগটা নিলাম আমি, বললাম, 'মিস্টার জামনুজ্জামান,আপনার একটা ছোট্ট প্রতিকৃতি দেখেছি আমি, যে বাড়িটায় আপনি একসময় থাকতেন, ওখানে। বাড়িটা হয়তো আপনিই বানিয়েছিলেন- পুরোটা যদি না-ও হয়, আংশিক তো বটেই- ভূতের গলিতে। আপনি ওই বাড়ির পাশ দিয়ে আজ সকালে হেঁটে গেছেন।

কথা শেষ করার পরই শুধু চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতে পারলাম। আমার দিকে তার দৃষ্টি এমনই স্থির হয়ে আছে, আমি আর চোখ সরাতে পারছি না- একজোড়া সপনেত্র আমাকে যেন জাদু করেছে।

তবে কীভাবে জানি না, অনেকটা নিজের অজান্তেই ফিসফিস করে উঠলাম, যেন সামনে বসা ব্যক্তি জোর করে আমার চিন্তা-ভাবনাকে শব্দের মাধ্যমে অনুবাদ করিয়ে নিচ্ছেন।

'জীবন এবং বিজ্ঞান, এ-দুটো অসীম রহস্যময়,আমি সেই রহস্যের ছাত্র। এই দুই রহস্যের একটা সাবজেক্ট হলো অকাল্ট-গুপ্ত এবং ঐন্দ্রজালিক জ্ঞান।

আমি বেশ কজন অকাল্ট প্রফেসরকে চিনি। কাজেই, সেই সূত্র আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমি রাখি।' এরপর গলা আরও খাদে নামিয়ে নির্দিষ্ট একটা সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করলাম।

'বহুত খুব', জবাবে বললেন তিনি, গলা শুকনো খটখটে।

"আপনার অধিকার সম্পর্ক আমি ওয়াকিবহাল হলাম এবং আপনাকে ইনকার করলাম না। আপনার সওয়ালটা পেশ করুন।"

'মানুষের ইচ্ছাশক্তি, নির্দিষ্ট একটা শারীরিক ও মানসিক ধাতে, কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হত পারে? চিন্তার দৌড় কত দূর? এখনই চিন্তা করুন, দম নেওয়ার আগেই আপনি ব্রাজিলে পৌছে যাবেন ঠিক। কিন্তু আমার চিন্তার কোনো ক্ষমতা ব্রাজিলে নেই।"

“আপনার চিন্তাটা জবানে, প্রতীকে, সংকেতে বা নকশায় প্রকাশ করেন, তাহলে হয়তো থাকবে; একটা চিন্তা আপনি লিখে ফেলতে পারেন, আগে হোক বা পরে, সেটা হয়তো গোটা ব্রাজিলের পরিস্থিতি বদলে দেবে। একটা চিন্তা ছাড়া কানুন কি? সুতরাং চিন্তা অনন্ত, সুতরাং চিন্তার ক্ষমতা আছে; ওটার মূল্য অনুপাত হিসেবে নির্ধারিত হয় না-শক্তিশালী মন্দ চিন্তা মন্দ আইন একই রকম শক্তিশালী করে তৈরি করতে পারে, যেমন একটা শক্তিশালী ভালো চিন্তা অতটাই শক্তিশালী ভালো আইন তৈরি করতে পারে।”

‘হ্যাঁ; আপনি যা বলছেন, আমার নিজের থিওরির সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। অদৃশ্য তরঙ্গ বা প্রবাহের মাধ্যমে মানুষের একটা মাথা এক বা একাধিক অন্যান্য মানুষের মাথায় নিজের ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করাতে পারে, দৃশ্যমান প্রক্রিয়ায় একটা চিন্তা যে গতিতে ছড়ায়, সেই একই রকম দ্রুততার সঙ্গে।’

‘আলবত।’

‘এটা টেলিপ্যাথির একটা শাখা।’

‘তা তো বলতে পারব না।’

‘বেশ। কিন্তু চিন্তা যেহেতু ধ্বংসযোগ্য নয়, এর যেহেতু বিলুপ্তি নেই, চিন্তক চিরবিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরও এই বাস্তব পৃথিবীর বুকে তার ওই চিন্তা-ভাবনা থেকে যায়। কাজেই জীবিত ব্যক্তিদের চিন্তার হয়তো মৃত

মানুষদের চিন্তাক জাগানোর কিংবা উজ্জীবিত করার ক্ষমতা আছে-বেঁচে থাকার সময় তারা যা কিছু চিন্তা করত, সেগুলোকে?’

‘এটা আসলে আপনার প্রশ্ন নয়, কাজেই আমি জবাব দেব না।’

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে; আমার প্রশ্ন হলো, মৃতরা এখন যদি কিছু চিন্তা করে, মানে আদৌ যদি চিন্তা করতে সমর্থ হয়,আমরা জীবিতরা কি সেটার নাগাল পাব? আমার ধারণা পাব না। আপনি কী বলেন?’

‘আমি জবাব দিতে ইনকার করব, আমার বিবেচনায় যদি দেখি চিন্তার শক্তি এবং পরিধির জন্য আপনি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিচ্ছেন। তবে বলে যান। আপনি একটা বিশেষ সওয়াল মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন বলে মালুম হচ্ছে।’

“ধরুন, অদ্ভুত এক মন-মানসিকতার ভেতর প্রবলইচ্ছাশক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দিল তীব্র একটা ঘৃণা, বিজ্ঞানের নাগালে পাওয়া যায় এমন সব স্বাভাবিক উপায় ও মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে ওই মানসিকতা এবং তীব্র ঘৃণা এমন সব কাণ্ড ঘটাতে পারে, প্রাচীনকালে লোকে যেটাকে অশুভ বা ক্ষতিকর জাদু বলত?”

“আমি শুনছি।”

'সেই ক্ষতিকর অশুভ শক্তি মানুষ বসবাস করে এমন জায়গার দেয়ালে দেয়ালে হানা দিতে পারে, ভূত বা অপচ্ছায়ার আদলে, যে দেয়ালের ভেতর অপরাধপ্রবণ চিন্তা লালন করা হয়েছে এবং অপরাধ ঘটানো হয়েছে?

সব মিলিয়ে, আমি যা বুঝেছি, তার সংক্ষেপ হলোঃ- বহুকাল আগে ওখানে মঞ্চস্থ নাটকের অশুদ্ধ, দুর্বোধ্য,টুকরো টুকরো অংশ ব্যবহার করে সহানুভূতি, সংগতি আর সহমর্মিতা দাবি করবে ওই অশুভ ইচ্ছাশক্তি'

'বহুত খুব।'

'এভাবে চিন্তাগুলো কোনো শৃঙ্খলা ছাড়াই পরস্পরকে পাশ কাটাবে, দুঃস্বপ্নের ভেতর একটা বিদেহী অস্তিত্বকে যে রকম করতে দেখা যায় ভৌতিক ছায়া কায়া আর শব্দ তৈরি করছে, সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে একটা আতঙ্ক। এসব দৃশ্য ও শব্দ বাইরের দুনিয়া থেকে এসেছে, তাই সেটা আতঙ্কের কারণ, ব্যাপারটা তা নয়, আতঙ্কের কারণ হলো, ওসব এই দুনিয়ারই পুনর্জীবিত দৃশ্য ও শব্দ, নতুন করে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে অশুভ একট নাটকের মধ্যে দিয়ে অশুভ এক মরণশীল ব্যক্তির নির্দেশনায়।'

'কেয়া বাত।'

'এবং মানুষের ওই মাথার সক্রিয় ভূমিকার দ্বারা এসব জিনিস-অপচ্ছায়া মানুষের ক্ষমতা অর্জন করে।সেই অর্জিত ক্ষমতাবলে বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতো আঘাত করা যায়, সেই আঘাতে মানুষ যারাও যেতে পারে, যদি প্রতিপক্ষ

ব্যক্তির চিন্তা আরও বেশি শক্তিশালী এবং উন্নতমানের না হয়। ওগুলো এমনকি প্রচন্ড শক্তিশালী হিংস্র জানোয়ারকেও খুন করতে পারে, যদি ভয় পাওয়াতে পারে ওটাকে; আবার অতি ক্ষীণকায় দুর্বল ব্যক্তির গায়ে ফুলের একটা টোকাও মারতে পারে না, যদি সেই ব্যক্তির মনে থাকে প্রচুর সাহস।'

'সত্যি দারুণ।'

"এভাবে, আমরা যেমন পুরোনো দিনের গল্পে পড়ি জাদুকরের ডেকে আনা বিদেহী আত্মার হাতেই ছিন্নভিন্ন হয়েছে জাদুকর কিংবা আমরা যেমন প্রচলিত লোককাহিনিতে শুনি যে প্রাগজ্যোতিষপুরে একজন তান্ত্রিক সাধক আরেক তান্ত্রিক সাধককে খুন করেছে স্রেফ তার ছবিতে ছুরি গেথে..."

'প্রাগজ্যোতিষপুর?' শেখ জামানুজ্জামান ভ্রু কুঁচকালেন। 'এটা তো কামরূপ কামাক্ষার আগের নাম, আপনি জানলেন কীভাবে?'

'জানি আর কি।'

'বহুত খুব।'

'ঠিক যেভাবে মেঘের ভেতর নিরীহ ভঙ্গিতে লুকিয়ে থাকা বজ্র প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অকস্মাৎ দৃষ্টিগোচর হয়, চোখ পরিষ্কার একটা আকৃতি পায় এবং যে জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আঘাত হেনে সেটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে, ঠিক একইভাবে এর মধ্যেও সত্যতা আছে বলে মনে করি যে নিরেট একটা অস্তিত্বকে ছদ্মবেশে মোড়া হয়েছে, তার নিজস্ব অশুভ প্রবণতা

অনুসারে নির্দিষ্ট উপকরণ এবং তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে, সাধারণত সেগুলো নিক্রিয় এবং ক্ষতিকর নয়, ভীতিকর আকৃতি এবং প্রচণ্ত বল-শক্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে শেখ জামান শান্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন, 'অতিশয় গোপন বিদ্যায় নজর বুলিয়েছেন আপনি। আমি জানি না সেটা আপনার জন্য কতটুকু মঙ্গল বয়ে আনবে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক,একজন মরণশীল আপনার বর্ণনা করা ক্ষমতা অর্জন করলে, অবশ্যই সে ধবংসাত্মক এবং অশুভ হবে।'

'আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে যদি শক্তিটাকে ব্যবহার করা হয়, চরম ধবংসাত্মক এবং চরম অশুভ হবে- যদিও, প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে আমার বিশ্বাস, শুভ ও মঙ্গলের কোনো ক্ষতি সে করত পারবে না। তার ইচ্ছাশক্তি আপনজন বা যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মিল আছে, শুধু তাদের ওপর কাজ করবে, কিংবা যাদের ভেতর সে তার শক্তি বিনা বাধায় প্রবেশ করাতে পারে।'

'জি, হুজুর, কথাটা এবার না বলে পারছি না- আপনি অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন।'

'এখন আমি একটা আশ্চর্য মানুষের উদাহরণ দেব, তাঁর ক্ষেত্রে যা ঘটানো হয়েছে তা হয়তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও আইনের মধ্যেই ঘটেছে, অথচ রূপকথার মতো অসম্ভব বলে মনে হয়, ধ্যানে বসতে অভ্যস্ত একজন

যোগীকে পর্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেবে। তার আগে অন্য একটা প্রসঙ্গ। আশা করি অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের কথা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন,

যাকে "ডক্টর অব ইউনির্ভাসালিস" বলা হয়। তাঁর জাদুকরী ক্ষমতা সম্পর্কেও যারা জানার তারা জানে। আত্মাকে কীভাবে জাগানো যায়, কীভাবে প্ররোচিত করা যায়, তারপর কীভাবে সেটাকে দিয়ে হুকুম তামিল করানো যায়, এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন, প্রক্রিয়াটি অবশ্যই মাত্র অল্প কজনের জন্য উপযোগী এবং মূল্যবান বিবেচিত হবে এবং-ওই লোককে অবশ্যই একজন জাদুকর হিসেবে জন্ম নিতে হবে! অর্থাৎ জন্ম নিতে হবে অদ্ভুত শারীরিক-মানসিক গঠন বা প্রকৃতি নিয়ে, একজন কবি যেমন জন্ম থেকেই কবি।'

শেখ জামান আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন, তবে এখন তাঁর চোখ দুটো আধবোজা।

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলাম আমি। 'এমন মানুষ খুবই বিরল, বুদ্ধিমত্তার চরম বিকাশ হিসেবে যাঁরা তাঁদের প্রকৃতির মধ্য এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ধারণ করেন, সাধারণত তাঁদের এই বুদ্ধিমত্তা খানিকটা মোচড় খাওয়া হয়, তাতে কিছুটা বিকৃতি থাকে, কিংবা সামান্য অসুস্থতা। তবে তাঁদের রয়েছে যেকোনো একটি বস্তুর ওপর বিস্ময়কর মাত্রায় মনোনিবেশ করার সক্ষমতা- যে দূর্ধর্ষ সক্ষমতাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি বলি। কাজেই,বুদ্ধিমত্তা

পুরোপুরি নিখুঁত না হওয়া সত্ত্বেও ওই শক্তির জোরে বহু কিছু অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নিতে পারেন তাঁরা।'

একটু নড়েচড়ে বসলেন শেখ জামানুজ্জামান। ঠোঁটে মুচকি একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, বললেন,'আমার যেন বোধ হচ্ছে এ রকম কোনো জাদুকরকে আপনি চেনেন।'

'চিনি মানে, এ রকম এক আশ্চর্য জনাবকে কল্পনা করি, উদাহরণ হিসেবে তাঁকেই সামনে আনতে চাইছি', বললাম আমি। 'জন্মসূত্রে, পুরস্কার হিসেবে, এই অতুলনীয় প্রকৃতি পেয়েছেন তিনি, উপরি হিসেবে পেয়েছেন আরও কিছু অনুষঙ্গিক শক্তি। সমাজে আমি তাঁর জায়গা অনেক উঁচুতে রাখব। ধরে নেব অবশ্যই তিনি অসম্ভব ভোগী হবেন, কাজেই জীবনকে তিনি বাসবেন ভালোও অসম্ভব। হবেন মারাত্মক আত্মকেন্দ্রিক, ভয়ংকর গর্ব থাকবে, এত বেশি অহংকারী যে কাউকে গ্রাহ্য করবেন না এবং তার সমস্ত মনোযোগ থাকবে শুধু নিজের ওপর। তাঁর মোহ হবে বেয়াড়া, তিনি থামতে জানবেন না, তার কাছে পবিত্র স্নেহ বলে কিছু নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে যেটার জন্য ক্ষুধার্ত সেটা তৎক্ষণাৎ পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠতে জানেন, জানেন তার অর্জনের পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে ঘৃণা করতে। তিনি রোমহর্ষক অপরাধ করতে পারেন, কিন্তু অনুতপ্ত হন সামান্যই। নিজের কুকর্মের জন্য আত্মধিক্কারে না ভুগে অন্যকে কাউকে দায়ী করে অভিশাপ দেন। তাঁর প্রকৃতিই পথ দেখিয়ে বিচিত্র সব পরিস্থিতির ভেতর নিয়ে গিয়ে ফেলে তাঁকে, রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির গোপন জ্ঞান অর্জন করেন তিনি, তাতে তাঁর অহমিকা

আরও বাড়ে তিনি একজন খুঁতখুতে পর্যবেক্ষক, পর্যবেক্ষণ করা তাঁর একটা নেশা। আমরা তাঁকে ক্যালকুলেটারও বলতে পারি, কমপিউট করতে ওস্তাদ, যদিও তাঁর এসব গুণ সত্যের খোঁজে ব্যবহার করা হয় না, ব্যবহার করা হয় নিজেকে আরও তীক্ষ্ণ এবং নিজের সক্ষমতাকে আরও বাড়ানোর কাজে, তবু আমরা তাকে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে কল্পনা করতে পারি। এ রকম একটা অস্তিত্ব, আমি মনে করি, অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিখে ফেলেন যে তাঁর দক্ষতা আর কলা-কৌশল অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো, তারপর তিনি তাঁর ওই সব গুণকে আরও ভালো করার জন্য প্রকৃতির দর্শন থেকে পাঠ নেন। জীবনকে তিনি ভালোবাসেন, ভয় পান মৃত্যুকে, তার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে বিস্ফোরিত নেবুলার প্রচন্ডতা নিয়ে একটাই ইচ্ছা প্রবাহিত হচ্ছেঃ- বেঁচে থাকব, বেঁচে থাকব, বেঁচে থাকব। নিজের তারুণ্য তিনি ধরে রাখতে পারেননি, মৃত্যুর এগিয়ে আসাকে পুরোপুরি ঠেকিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন,

নিজের রক্ত-মাংসকে অমরত্ব দান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি; তবে একটা পর্যায় পর্যন্ত সময়কে তিনি ফাঁকি দিতে পেরেছেন, এবং সেটাও কম অবিশ্বাস্য বা কম অসম্ভব নয়। এক দিনে আমি যতটুকু বুড়ো হব, অতটুকু বুড়ো হতে তার হয়তো সময় লাগবে এক বছর। তাঁর তীব্র ইচ্ছাশক্তিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটা পদ্ধতির মধ্যে ফেলে, বহুল ব্যবহার ছেঁড়া-ফাড়া নিজের কাঠামোর ওপর চালানো বা আরোপ করা হয়। তিনি বেঁচে-বর্তে থাকেন। তাঁকে একটা বিস্ময় বা একটা মিরাকল বলে মনে নাও হতে

পারে, তিনি সময়ে সময়ে মারা যান, যদিও তা হয়তো শুধু বিশেষ কিছু মানুষের কাছে।’

শেখ জামানুজ্জামানের মার্জিত কণ্ঠস্বর থেকে নরম সুর বেরোল,

‘আমি লা-জওয়াব!’

‘নিজের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট সম্পদ সরিয়ে ফেলার পর পৃথিবীর একটা কোণ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি, দূর থেকে লক্ষ্য রাখলেন তাঁর দাফন-কাফন যথারীতি সম্পন্ন হলো কি না। উদয় হলেন এই পৃথিবীর আরেক প্রান্তে, যেখানে কারও মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে বসতি গাড়লেন এবং আগের মতো জীবনের লোকজন তাঁর চেহারা পুরোপুরি ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানে আর ফিরলেন না। স্নেহ-ভালোবাসা থাকলে তাঁর জীবনটা খুব দুঃখেরই হতো নিজের বলতে নিজে ছাড়া আর কেউ তাঁর নেই। সত্যিকার একজন ভালোমানুষ তাঁর এ রকম দীর্ঘজীবন কামনা করবেন না, মেনেও নেবেন না। এবং তিনি, এই রহস্যের পেছনে সত্যিকার যে সত্যতা আছে, খারাপ-ভালো কোনো মানুষকেই তা জানাতে চান না, জানাতে পারেন না। এবং শুধু আমার কল্পনায় নয়, এ রকম মানুষের অস্তিত্ব বাস্তবেও সম্ভব; এতক্ষণ ধরে আমি যে-রকম বর্ণনা দিলাম, তার সঙ্গে হুবহু মিল আছে এমন এক ব্যক্তি এই মুহূর্তে আমার সামনে বসে আছেন! বাদশা নামদার... আমলে, গৌড়ীয় বঙ্গের নাজিম... লোভ-লালসা চরিতার্থ এবং জলসাঘরে নৃত্য-গীত উপভোগের মধ্যবর্তী সময়ে একদিকে তিনি

আলকেমিস্ট, আরেক দিকে জাদুকর; একদিকে ধোঁকাবাজ, আরেক দিকে অপরাধী-ঢুঁ মারতে এসেছেন ভূতের গলির ওই বাড়িতে, যেটা হানাবাড়ি হিসেবে লোকে চেনে, যে বাড়ির সামনে আজ আপনাকে দেখা গেছে। এ দেশে যত দিন পরই আপনি ফিরে এসে থাকুন, আপনার বিরুদ্ধে হত্যা করার অভিযোগ আছে, আপনার উপস্থিতি টের পেলে দেশের আইন আপনাকে খুঁজবে, ধরতে পারলে উচিত সাজাও আপনি পাবেন। আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়ে বলছি, আমাদের এই শহর ছেড়ে মানে মানে কেটে পড়ুন, নিরীহ ভালামানুষদের কোনো ক্ষতি না করে,ফিরে যান আপনার উপযুক্ত ঠিকানা শুকনো সেই মরুভূমিতে।'

আশ্চর্য মিষ্টি সংগীতের মূর্ছনা, শুধু কানে নয়, তা যেন আমার গোটা অস্তিত্বে ঢুকে নরম করে দিল আমাকে, আমি শুনতে পেলামঃ-

'আপনার মতো একজনকে ১০০ বছর ধরে হয়রান হয়ে খুঁজছি আমি। এখন যখন আপনাক পেয়েছি, আমি কি আকাঙ্ক্ষা করেছি তা না-জানা পর্যন্ত আমরা বিচ্ছিন্ন হব না। যে অর্ন্তদৃষ্টি অতীত দেখতে পায়, এক এক করে পর্দা সরিয়ে ভবিষ্যত ঢুকে পড়ে, সেই অন্তর্দৃষ্টি এই মুহূর্তে আপনার মধ্যে বিরাজ করছে- এর আগে কখনো কারও মধ্যে দেখিনি, ভবিষ্যতেও আর কখনো কারও মধ্যে দেখব না। এটা রোগশয্যায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে কারও প্রলাপ বকা নয়, নয় কোনো বিস্ময় বালিকার লাগামছাড়া অবাস্তব কল্পনা, বরং মজবুত এবং খোশ তবিয়ত এক শিক্ষিত জনাবের তরফ থেকে যুক্তি দিয়ে সাজানো়া বাণী, যার উৎস তারিফ করার যোগ্য উমদা একটা মস্তিষ্ক।

আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, ডিয়ার স্যার, আপনার ঘুম পেয়েছে। এই তো নিদ এসে আপনার চোখের পাতায় বসল।এবার ওপরে উঠন, সামনে তাকান!'

৮

তাঁর কথা শেষ হতে যা দেরি, অনুভব করলাম আমি যেন নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছি ঈগলের প্রকান্ড ডানা মেলে। আমার কোনো ওজন নেই, অনায়াসে ভেসে থাকতে পারছি বাতাসে। কামরা ছাদবিহীন।মহাবিস্তার আকাশবিহীন। আমি আমার শরীরে নেই, কোথায় আছি জানি না-শুধু জানি এ সময়ের উর্ধ্বে, দুনিয়ারও উর্ধ্বে। আবার সেই মিষ্টি-মধুর ফিসফিস শুনতে পেলাম।

"আপনি ঠিক বলেছেন। ইচ্ছাশক্তির গূঢ় রহস্য আমি আয়ত্ত করেছি, এ কথা সত্যি; এবং ইচ্ছাশক্তি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে আমি দেরি করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু মৃত্যু শুধু বয়স ধরে আসে না। আমি কি

দুর্ঘটনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব যেগুলো মানুষের জন্য অকাল মৃত্যু ডেকে আনে? না; প্রতিটি দুর্ঘটনা অলৌকিক প্রস্তুতি বা হস্তক্ষেপের ফল। এর সামনে মানুষের ইচ্ছাশক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে। একসময় আমি তাহলে মারা যাব, এখন থেকে বহু বহু বছর পর; প্রশ্ন হলো, সময়ের সঙ্গে হাত ধরে, নাকি ওই কারণে যেটাকে আমি দুর্ঘটনা বলি?”

“ওই কারণে, যেটাকে আপনি দুর্ঘটিনা বলেন।”

‘শেষটা এখনো তা অনেক দূরে, তাই না?’ জিজ্ঞেস করল ফিসফিস কণ্ঠস্বর, একটু যেন কাঁপা কাঁপা। ‘আমার জীবনের ওপর সময় যেভাবে কাজ করে সে হিসেবে, হ্যাঁ, অনেক দূরে। তার আগে, ওই প্রকৃতির মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারব কি না, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে এত সব গোপন জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তাদের সুখ-দুঃখ আর আনন্দ-উৎসবে ব্যাকুল আগ্রহ দেখানো আগের মতাই সম্ভব হবে কি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করা যাবে তা এবং সেই বিরল ক্ষমতা আমার দ্বারা কি অর্জন করা সম্ভব হবে, যা শুধু রাজা- খুব খারাপ কথা ওদের সংখ্যা কমতে কমতে এই পর্যায়ে নেমে এসেছে-যা সাধারণত শুধু সরকারপ্রধানদের হাতে থাকে?’

‘নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে এখনো আপনি দুনিয়া কাঁপাবেন, প্রচুর হইচই বাধাবেন। একটা বিস্ময়কর ডিজাইন আপনি, কয়েক শতাব্দী ধরে বেঁচে থাকার মেয়াদ অনুমোদন করা হয়েছে। যেসব গোপন রহস্য আপনি সংগ্রহ এবং আবিষ্কার করেছেন, সবই মানুষের কাজে লাগতে পারে, ওগুলো

যদি আপনি কোথাও লিখে রেখে যান। এসব আপনি অর্জন করায় এই মুহূর্তে বহু প্রজন্মের মাঝখানে একজন আগন্তুক বলে মনে হচ্ছে আপনাকে, কিন্তু ওগুলো যখন তাদের উপহার দেবেন, আপনি হবেন তাদের নমস্য। একটা বড়সড় ঘূর্ণিঝড় গাছপালা আর ঘরবাড়িকে যেভাবে টেনে নেয়, ইচ্ছেমতো পাক খাওয়ায়, গিলে নেয় আরও ভেতরে, তারপর ছুড়ে দেয়, আছড়ে ফেলে, আপনার জাদুর ঘূর্ণিও ঠিক সেভাবে জাতি আর রাষ্ট্রগুলোকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে। হতবুদ্ধিকর ধ্বংসক-তবে ধ্বংসের মধ্যেও, নিজ ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে,একজন সৃজনশীল নির্মাতার মহান উচ্চতায় পৌছে দিন নিজেকে আর সেই দিন, সেটাও এখনো অনেক দূরে?'

'অনেক দূরে ; যখন আসবে, ধরে নেবেন দুনিয়ার বুকে আপনার সময় শেষ হয়ে এসেছে।'

"শেষটা কী হবে, কীভাবে হবে? পুব, পশ্চিম, দক্ষিণ আর উত্তরে তাকান।"

'উত্তরে আপনি গেছেন, তবে আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিষেধ করায় বেশি দুরে এগোননি, তা এগোলে আপনার চোখে হয়েতো একটা কালোছায়া ধরা পড়ত। ওই কালোছায়া বা অপচ্ছায়া আপনাকে ধরবে। ওটাই মৃত্যু। আমি একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি- ওটার ওপর ভর করা হয়েছে, কী বা কারা সব ভিড় করেছে ওখানে। ওই ভূতুড়ে জাহাজ ধাওয়া খেয়ে পালাচ্ছে।

হতভম্ব নাবিকেরা ওই জাহাজের পিছু ছাড়ছে না। ওটা বরফের রাজ্যে প্রবেশ করল, তারপর এমন অদ্ভুত আকাশের তলা পেরোল, যেটা অবিরত

উল্কাপাতে টকটকে লাল হয়ে আছে। বরফের তৈরি শৈলচূড়ার মাথার ওপর একজোড়া চাঁদ ঝুলতে দেখছি। আমি দেখতে পাচ্ছি সাদা বরফের কঠিন ঝুরি আর পাথুরে বরফের মাঝখানে আটকা পড়েছে জাহাজটা। ডেকের ওপর লাশের ছড়াছড়ি-ওগুলোর হাতে-পায়ে সবুজ ফোসকা দেখতে পাচ্ছি। সবাই মারা গেছে, শুধু আপনি বাদে। তবে সময়গতি তার যতই ধীর হোক আপনার ওপর ভালোই দাঁত বসিয়েছে। আপনার ভ্রুতে বয়সের চিহ্ন। মস্তিষ্কের কোষে বিশ্রামে চলে গেছে ইচ্ছাশক্তি। তবে সে ইচ্ছাশক্তি, যদিও দুর্বল, তারপরও অন্য সব মানুষের চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী, যার সাহায্যে তখনো আপনি বেঁচে রয়েছেন, তবে যেন দুর্ভিক্ষে হাড্ডিসার হয়ে পড়েছেন, হাড়ের ওপর শুধু চামড়া ঝুলছে। মৃত্যু-ছড়ানো ওই অঞ্চলে প্রকৃতি এখন আর আপনার নির্দেশ মানতে রাজি নয়। আকাশ ওখানে লোহার আকাশ, বাতাসের আছে ইস্পাতের আংটা, বরফ এখানে পাথরে গোঁজ হয়ে আটকে রেখেছে জাহাজটাকে। কান পেতে শুনুন কেমন গোঙাচ্ছে আর কাতরাচ্ছে। বরফ ওটাকে আপন করে নেবে। আগুন যেভাবে একটা খড়কে আপন করে নেয়। আপন শব্দটা এখানে কী নৃশংস, তাই না? তবে একজন মানুষ হেটে সামনে গেছেন, জাহাজ আর তার লাশগুলাকে পেছনে ফেলে। বরফের খাড়া গা বেয়ে একটা হিমশৈলের মাথায় চড়লেন তিনি, তাঁর আকৃতির ওপর চোখ মেলে রেখেছে জোড়া উপগ্রহ। ওই ব্যক্তি আসলে আপনি। আতঙ্ক শুধু আপনাকে নয়, আপনার ইচ্ছাশক্তিকেও গ্রাস করেছে।

পাথুরে বরফের খাড়া ঢালের ওপর ধূসর-সাদাটে রঙের ভীতিকর কী সব জিনিসকে চার পায়ে হেঁটে আসতে দেখছি আমি।

হ্যাঁ, ওই তো, উত্তরমেরুর হিংস্র ভাল্লুকের দল শিকারের গন্ধ পেয়ে হেলেদুলে ওপরে উঠছে। আপনার আরও কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ওগুলো। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নাচছে, ডিগবাজি আর গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাহলে বলি শুনুনঃ-

সেদিনের প্রতিটি মুহূর্তকে, আপনি যে শতাব্দীগুলোয় বেঁচেছিলেন তারচেয়ে বেশি দীর্ঘ বলে মনে হবে আপনার। এবং সাবধান! মৃত্যুর পরও এই মুহূর্তগুলোই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনন্ত জীবন দেবে আপনাকে-স্বর্গে কিংবা নরকে।'

'চুপ,' ফিসফিস আওয়াজ হলো, কিন্তু সেদিন, আপনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, এখনো বহু দূরে! আমি বরং দামেস্কের গোলাপ বাগানে ফিরে গিয়ে...ঘুম দিই।'

আমার চোখের সামনে দুলে উঠল কামরা। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। তারপর যখন জ্ঞান ফিরল, চোখ মেলে ডক্টর অনিন্দ্যকে দেখতে পেলাম-আমার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসে আছেন, কী ভেবে কে জানে আপনমনে হাসছেন।

শান্ত সুর আমাকে তিনি বললেন, ‘আপনাকে আমি বলতে শুনেছি সম্মোহন কখনোই আপনাকে কাবু করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধু শেখ জামানুজ্জামানের কাছে আপনার হার হলো...’

‘তিনি কোথায়?’

‘চলে গেছেন। আপনি জ্ঞান হারানোর পর হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, ‘আপনার বন্ধু এক ঘণ্টার আগে জাগবেন না ।” আর হ্যাঁ, এই মোবাইল ফোনটা আপনাকে দিতে বলেছেন।’

ডক্টর অনিন্দের হাত থেকে ফোনটা নিলাম। এটা আমারই ফোন, হানাবাড়িতে আমার চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক সুরে জানতে চাইলাম।

‘ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?’

“হোটেল অপরূপায়।”

“চলন যাই। আমার সঙ্গে আপনি থাকলে ভালো হয়,” ডক্টর অনিন্দ্যকে বললাম। “তাকে আমার একটা কথা বলার আছে।”

‘ঠিক আছে, চলুন না।’

ওখানে আমরা তাঁকে পেলাম না, হোটেল কর্তৃপক্ষ জানালেন মিনিট বিশেক আগে শেখ জামানুজ্জামান বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন

তা কেউ জানে না। কেউ তাঁকে ট্যাক্সি ডেকে দেয়নি, তিনি নিজেই লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের

গাড়িটাকেও হোটেলের সামনে দেখা যায়নি। আমরা যখন রিসিপশনিস্টের সঙ্গে কথা শেষ করে লাউঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে আসব, এই সময় একজন পোর্টার হন হন করে হেঁটে আমার পাশে চলে এল, নরম সুরে জানতে চাইল, 'আপনি ডাক্তার আজাদুল কান্তিক,স্যার?'

'হ্যাঁ। কেন?'

আমাদের একজন গেস্ট, মিস্টার শেখ জামানুজ্জামান, এই চিঠিটা আপনার জন্য রেখে গেছেন, স্যার-এই ভেবে যে অপনি যদি তাঁর খোঁজে এখানে আসেন।

আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল পোর্টার।

চিঠিটা এ রকমঃ-

"আমি চেয়েছিলাম অপনার মনে যা কিছু আছে সব আপনাকে দিয়ে উচ্চারণ করাব। আমার নির্দেশ আপনাকে পালন করতে হয়েছে। এভাবে আমি আপনার ওপর আমার ক্ষমতা জাহির ও প্রতিষ্ঠিত করেছি। আজ থেকে পরবর্তী তিন মাস জীবিত কোনো প্রাণীকে আপনি জানাতে পারবেন না আমাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে-আপনি এমনকি এই চিঠিটাও পাশে দাড়ানো বন্ধুকে দেখাতে পারবেন না।

ওই তিন মাস, আমার সর্ম্পকে পরিপূর্ণ নীরবতা বহাল থাকবে। আপনার ওপর আমার এই নিষেধাজ্ঞা আপনি চ্যালেঞ্জ করতে চান? অমান্য করার চেষ্টা চালিয়ে দেখুন। তিনমাস শেষ হলে প্রভাব কেটে যাবে। বাকি সবকিছুর জন্য আপনাকে আমি রেহাই দিলাম। আপনার কবর আপনাকে গ্রহণ করার এক বছর এক দিন পর ওখানে আমি একবার ঢুঁ মারতে যাব।"

এভাবেই শেষ হয়েছে এই অদ্ভূত কাহিনি, যে কাহিনি আমি কাউকে বিশ্বাস করতে বলি না। এটা আমি লিখতে বসেছি ওপরের ওই চিঠি পাওয়ার ঠিক তিন মাস পর। তার আগে বহু চেষ্টা করেও লিখতে বসতে পারিনি। চিঠিটাও ডক্টর অনিন্দ্যকে দেখানো সম্ভব হয়নি, তাঁর জরুরি অনুরোধ সত্ত্বেও, যে চিঠি আমি হোটেল অপরূপার লাউঞ্জে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

সমাপ্ত

